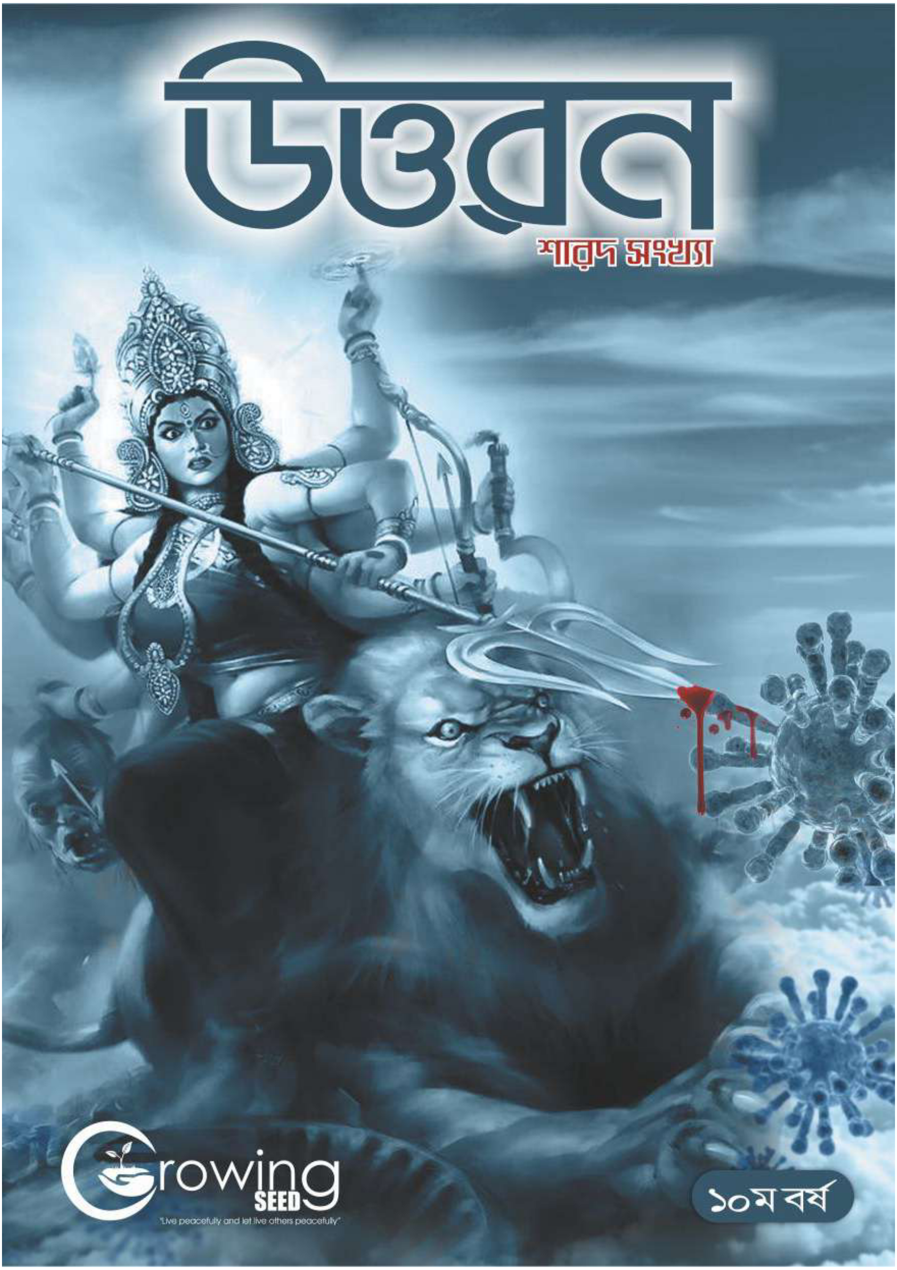
উত্তরন
শারদ সংখ্যা
Growing
SEED
"Live peacefully and let live others peacefully"
১০ম বর্ষ

উত্তরন

শারদ সংখ্যা - ২০২০

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook.com/growingseedinfo
লগঅন করুন : www.growingseed.in
টুইটার : @growingseed1
ইউটিউব : Growing Seed
ইনস্টাগ্রাম : growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের নয়।)

UTTARAN
Edited by : Growing Seed
₹ 30

দশম প্রকাশ :
২২-১০-২০২০

প্রকাশ :
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

মূদ্রক :
মহামায়া আর্টস্ এন্ড অফসেট
নেতাজীপাড়া, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস :
সুজিত দাস (মো: 8131973237)

প্রচ্ছদ :
অনুপম ভট্টাচার্য্য
Haploids advertising
Vadodara, Gujarat

মূল্য :
৩০ টাকা মাত্র

সম্পাদকের কলমে

বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বহু বছর আগেই প্রানীজগৎ সম্পর্কে এক বিস্ময়কর তথ্য আমাদের জানিয়ে গেছেন। আজ মহাবিশ্বের এই সংকটকালে তাঁর প্রদত্ত "প্রাকৃতিক নির্বাচন" এবং "বাঁচার জন্য সংগ্রাম" - উক্তিগুলোর যথার্থ আমরা সচক্ষে অনুধাবন করতে পারছি। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মত করে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি এবং এই সংগ্রামে যে জয়ী হবে, তাকেই প্রকৃতি তার মাধুর্য্য উপভোগ করার অধিকার প্রদান করবে।

প্রকৃতিতে বসবাসকারী সমস্ত জীবেরই নির্দিষ্ট সময় ধার্য্য করা আছে, আমাদের জন্যও তার কোন বিকল্প নেই। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা অনেক কিছু করে থাকি, তার মধ্যে অন্যতম সাহিত্য চর্চা। দিন দিন সাহিত্য চর্চার ধরণ পাল্টে গেলেও আমাদের জীবন থেকে তা দুরে সরে যায়নি। কিছু দিন আগে পর্যন্তও শিশুরা গুরুজনের কাছে গল্পের ছলে সাহিত্য চর্চা করত কিন্তু বর্তমানে তা পরিবর্তিত করে বিভিন্ন কার্টুনের মাধ্যমে টেলিভিশন বা ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়ে থাকে। বড়দের ক্ষেত্রেও বাড়ির বইয়ের তাকে ধুলো জমতে থাকলেও হাতের মুঠো ফোনটাতে কিন্তু কোন না কোন ভাবে সাহিত্যের চর্চা হয়েই যাচ্ছে। পরিবর্তনের ধারা বেয়ে এভাবেই বেঁচে থাকুক সাহিত্য আমাদের মাঝে।

বিনীত- সম্পাদক / প্রকাশক

Growing Seed

October, 2020

AGRIALLIS

Science for Agriculture and Allied Sector: A Monthly e Newsletter

A National Level Peer Reviewed e Magazine

on

Agriculture and Allied Sciences.

An Initiative by

GROWING SEED

www.agriallis.com

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

বিষয়	লেখকের নাম	ক্রমাঙ্ক
অতিমারীর দিনরাত্রি	বিধান চন্দ্র দে ----------------------------	০১
যতিহীনরথী	দেবাশিস চৌধুরী ------------------------	০৩
আগমনী	সৌমিত্র আচার্য্য ------------------------	০৪
করোনা	দীনবন্ধু সেন ----------------------------	০৪
উষ্ণতার অভিযোগ	দেবজ্যোতি আচার্য্য ----------------------	০৫
অবাস্তব	দেবাশীষ দাস ---------------------------	০৫
শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে	শিউলি শর্মা ------------------------------	০৬
বিষাদগাথা	নীলোৎপল গোস্বামী ----------------------	০৭
জীবন	শিবানী পাল ---------------------------	০৭
জোড়া শালিক	নীলাঞ্জনা দেবনাথ ------------------------	০৮
সিন্ধুনদের দেশ	অনিন্দিতা দেবনাথ ----------------------	০৯
ইম্প্রেশন্	পলাশ মালাকার ------------------------	০৯
শুধুই বিদ্রোহী নও	সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য --------------------------	১০
পরিচয়ের সন্ধানে	অনন্যা ভট্টাচার্য্য ------------------------	১১
নীল সরোবর	সুস্মিতা নাথ (সুমন) --------------------	১২
করোনার করুণা	স্বপন ধর -------------------------------	১৪
তোমার বাড়ি	শম্ভু শংকর চক্রবর্তী ----------------------	১৫
ধৈর্য্যই সুখের চাবি	মম্পি দে ------------------------------	১৫
করোনা কবলে আমরা	রিয়া পাল --------------------------------	১৬
আমার দুর্গা	দেবজ্যোতি দাস ------------------------	১৭
ইচ্ছে করে	পঞ্চতপা দেব --------------------------	১৮
নারী	দেবজিৎ চৌধুরী ------------------------	১৮
বিনোদন	মিস্মিতা দাস ---------------------------	১৯
কল্পনার বাস্তববাদী	বৈশালী দাস ---------------------------	১৯
সাধারণ মেয়ে	ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী -----------------------	২০
উদাসী প্রভাত	কানন দাশগুপ্তা সোম -------------------	২০
প্রথম প্রকাশ	বেবি শর্মা -----------------------------	২১
অদ্ভুত	সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য্য ------------------------	২১
কোভিড ১৯	সুকান্ত দাস ---------------------------	২২
আকুতি	তপা কর ------------------------------	২৩
নীলঘড়ি	লিটন শব্দকর -------------------------	২৩
পৃথকীকরণ	সপ্তর্ষিতা নাথ --------------------------	২৪
মাতৃছায়ার প্রতিদান	আশিষ দেবনাথ ------------------------	২৫
জন্মভূমি	সেলিম মুস্তাফা ------------------------	২৬
সাহিত্যের রোমাঞ্চ	দেবাত্র ভট্টাচার্য্য ------------------------	২৬
জীবন ঃ যুদ্ধের জয়	শেখর দেব ----------------------------	২৭
লেখনী	নির্ঝর পাল ------------------------------	২৮
বেরঙিন সময়ে	মিতালী দে ------------------------------	২৯
শারীরশিক্ষা ও বর্তমান সমাজ	প্রসেনজিৎ দেবনাথ ---------------------	৩০
করোনা নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা	দীপালোক ভট্টাচার্য্য ---------------------	৩১
অসংলগ্ন কথাবার্তা	দধিচী ------------------------------------	৩৪
আলো ও আঁধার প্রকৃতির নারী ও পুরুষ	সুস্মিতা আচার্য -------------------------	৩৬

ষোলয়ানা বাঙালীয়ানা

অক্টোবর-২০২০

(অনলাইন বাংলা ভাষা-উপভাষা নির্ভর নিবন্ধ প্রতিযোগিতা)

সেরা তিন

অতিমারীর দিনরাত্রি

–বিধান চন্দ্র দে

ক'দিন ধরেই এক অজানা আশঙ্কায় টুবাইয়ের মনটা বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছিল। মিয়ামী অষ্টম মানের ছাত্রী। ক্লাসে ফাস্ট। সেকেন্ড টুবাই। জোর কম্পিটিশন। কিন্তু এবারে টুবাইয়ের মনে সন্দেহ জেগেছে, সে কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারবে না। গুড্ডু দিনচারেক আগে হোয়াটস্ অ্যাপে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে অনলাইন ক্লাস শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে। এইটাকে টুবাই একদম স্ট্যাটিক থাকতে পারছে না। অনলাইন গেম টেম তার চয়েসে নেই। টিকটক, পাবজি, ক্লেস অফ ক্লেনর্স রকমারি কত কী ! নৈব নৈব চ ! – কেন জানি মনে হলো, অনলাইন ক্লাস স্ট্যাডি চালু হলে টুবাই পিছিয়ে পড়বে।

স্কুলবোর্ড মিটিঙে ডিসিশান হয়েছে ওয়ার্ল্ড এপিডেমিক 'কোভিড-১৯' যতদিন চলবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেইনের জন্যে অনলাইন ক্লাস হবে। এখানেই আশঙ্কিত টুবাই। রাতে ঘুম কমে গেছে। বার বার ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতে এক প্রকার ঘেমে নেয় উঠছে টুবাই।

সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সোঁ সোঁ অঝোর ধারা শব্দের মধ্যে কিছু ভালো লাগা আনন্দে কখন যে তার চোখে ঘুম এসেছিল..... সুন্দর এক পাহাড় ঘেরা পাথুরে নদীর কিনারে টুবাই বসে আছে। কিছু রডো ড্রেনডন ফ্লাওয়ার ফোঁটে আছে সারি সারি। গুড্ডু আর মিয়ামী নদীর ওপারে খরস্রোতা জলপ্রবাহে স্রোত ঠেলে এপারে আসতে পারছে না। ওদের দুজনের হাতেই কয়েকটি ব্রহ্মা কমল অর্থাৎ 'দ্য ফ্লাওয়ার অফ লাক'। লম্বা-উঁচু গ্রীবার কিছু অদ্ভুত মেরুন রঙের বার্ড। টুবাই গড় গড় করে বাংলার সরব পাঠ নেয় নি। জানেও না। শুধু বাবাই খুব কাছে এসে সস্নেহে মাথায় টুকি দিয়ে রাইমস্ রিছাইট করতো। টুবাই শুধু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো, বাবাই রিভাইভ করো। ভরাট-গুরুগম্ভীর ভয়েসে কতগুলি সুন্দর সুন্দর পক্ষীর নাম টুবাই অনেক শুনেছে। শালিক, দাঁড় কাক, শঙ্খচিল ইত্যাদি কত কী ? কিন্তু টুবাইয়ের মনে হলো এই পাখি গুলি অন্য রকম। টুবাইয়ের জিওগ্রাফি বইতে আফ্রিকার টাঙ্গানিয়ার মতো এই জায়গা দেখতে অনেকটা। কিছুতেই স্ফটিকের মতো সফেন সলিলা নদী পার হতে পারছে না গুড্ডু আর মিয়ামী। অথচ টুবাই কিঞ্চিত হেল্পও করতে পারছে না। ওরা প্রাণপনে চিৎকার করছে - হেল্প আস - হেল্প ... টুবাই দেখছে অতিকায় একটা কিম্ভূত প্রাণী গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। ওর গায়ে ক্রোকোডিলের লেজের মতো কাঁটা রয়েছে। বডিকানায় অনেকটা করমচা ফলের মতো সাদা আর টকটকে লাল। প্রাণীটা আসছে ওরা আর্তনাদ করছে .... গোঁ গোঁ শব্দ করে টুবাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। এদিকে সারা শরীর তার ঘর্মাক্ত। হাত-পা শীতলতা অনুভব হলো।

হ্যাগো, শুনতে পাচ্ছো, বলছি নিত্যদিন যে মাস্ক আর গাল্‌ভস, পরে গট্ গট্ করে

অফিস-কাছাড়ি হাট বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছো, ত ছেলেটার দিকে নজর দাও। সংসারটা তো পুরো আমার ঘাড়েই চেপে বসেছে। কলুর বলদের মতো মুখে মাক্স লাগিয়ে সবই করতে হচ্ছে। ঠিকে মাসী (ঝি) ছেড়ে দিয়েছি। ওমা কিসব কথা বলে গো ! দু'দিন ধরে টেম্পেরেচার আর গলা ব্যথা। করোনা ! টরোনা নয় তো ? ব্যস্, মামনির এক কথায় কাজ হারালো ঠিকে মাসী। বেচারী আত্মনির্ভর মাসী সেদিন থেকে হলো পরনির্ভর !!

টুবাইদের বাঁধা রাম গোয়ালা, দেড় লিটার দুধ দিতো প্রত্যহ। অথৈবচ। টাকা নিয়ে সেই হিসেব করে আর কাল থেকে দুধ দেবে না আর, বাবাই কেমন যেন রুক্ষভাবে কথাগুলো রামুকে বললেন। রামু আমতা আমতা করে বলল, কেন বাবু, ছানা ছেড়ে যায়, গন্ধ হয়। –না, না, ওসব কিচ্ছু না। দেখছো না এখনো ভ্যাকসিন বেরুয় নি। আর তুমি কিনা বাড়ি বাড়ি জার্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্যানিটাইজ পেনিটাইজ কিছুর কী বালাই আছে.... সংযত হও, পরে দেখা যাবে।

কালো মতো মুখ করে বিমর্ষ অধবদনে রামু গোয়ালা নীরবে নেমে গেল। টুবাইদের লিমোজেন গাড়ীটার দীর্ঘদিনের দেশোয়ালী ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে সুদূর ঝুমরীতালাইয়া। গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে পড়ে ধরছে রাম জং। নিউজ পেপারও বন্ধ করে দিয়েছেন বাবাই। একদম নিশ্চদ্র রাখতে মৃত্যুদূতদের অনুপ্রবেশ।

টুবাই সারাক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। টিভি, ল্যাপটপ, গেমস্ একদম একঘেয়ে হয়ে গেছে। খানিক সময় টিভিতে হিমালয় সীমান্তে লাদাখ, লেহ, রেজাংলা, গলবান ঘাঁটি, দৌলতবেগ ওল্ডীতে খাকী জলপাই কালারের সৈনিক জোয়ান ভাইদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-শ্রম প্রাণ বলিদানে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার চোখে জল এসে যায়। এই রকমই সেদিন উড়ি থেকে ছোটমামার বন্ধুর ডেডবডিটা কফিন বন্দী হয়ে এসেছিল। সেদিন ছোট মামাকে কাঁদতে দেখেছে টুবাই। কেন জানি সেদিন থেকেই তার মনে হয়েছিল যুদ্ধ মানেই মানব জাতির এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

আজ পর্যন্ত একটি যুদ্ধ টুবাই দেখেনি। শুধু দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাবাই করেছিল প্রত্যক্ষ। আর টুবাই শুধু টিভি দেখে দেখে যুদ্ধের ভয়াবহতায় শিহরিত।

দু'তলার একটি প্রকোষ্টে চাঁদ-সূর্য গুনে গুনে চরম ডিপ্রেশনে সময় কাটছে টুবাইয়ের। উহানের ভয়াবহ জীবানু সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করে টুবাইয়ের প্রায় দোড়গড়ায়। টুবাই শুনেছে চিনের জীবানু গবেষণাগারেই তৈরী হয়েছে বিশ্বগ্রাসী দৈত্য ! চিনদেশই সূতিকাগারে বাদুড়-ইঁদুর গবেষণায় এই সংক্রামক জীবানুর জন্ম ! অথচ কনফুসিয়ামের দেশ চিন। প্রাচীরের দেশ চিন। তথাগতের আশীর্বাদ ধন্য দেশ। ফা-হিয়ান, হুউয়েন সাঙ, সান-ইয়াৎ সেনের দেশ.... কত স্বপ্ন টুবাইকে দেখায়। পৃথিবী মানেই তার টেবিলে রাখা গ্লোবের মতো কত রঙিন, কত সুন্দর সে ভেবেছিল !!!

টিভিতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দেখাচ্ছে। ইতালী রেনেসাঁর দেশ, ফ্রান্স বিপ্লবের

পবিত্র ভূমি, আমেরিকা স্বাধীনতার মশালধারী দেশ, জার্মানী ঐক্যের বার্তাবাহী, ইংল্যান্ড সভ্যতার দ্যোতক, ব্রাজিল ফুটবলের দেশ টুবাই এই বয়সে এসব জেনেছে। আজ তার কাছে সবই কেম গুলিয়ে গেছে। সে আর পারছে না এত ভার বহন করতে। এযেন গ্রীসের দেবতা মানুস হারকিউলিস এ্যাটলাসের পৃথিবীর ভার বহন করার মতো।

হঠাৎ করে আলো জ্বাললেন বাবাই আর মামনি। মধ্যরাত। মশারির ভেতরে টুবাই একা ঘামছে, এক অজানা আশঙ্কায়, বাবাই আর মামনিকে দেখে টুবাই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। মশারী উঠিয়ে বাবাই-মামনি একসাথে টুবাইকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদে না বাবা, কাল আমরা অনেক দূরে বেড়াতে যাবো, আবার সবকিছু দেখবো, তোর জন্যে বাইজস এডু এ্যাপস এনেছি সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। ভয় পাবি না টুবাই – একসাথে দুজনেই বললেন। কান্না ভেজা কণ্ঠে টুবাই বলতে লাগলো – এভাবে সব মানুষ মরে যাচ্ছে, আমরা কি বাঁচবো ? একটা ভোরের পাখি তখন আকাশে ডেকে ডেকে উড়ে গেল।

* * * *

যতিহীনরথী

–দেবাশিস চৌধুরী

তোমার নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রা থেকে যে বিষবাষ্প
ভেসে আসে তাতে পুড়ে যায় সভ্যতার যাবতীয়
ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে তোমার নাম বিষময় হয়ে
থাকুক বিষহরি দেবী মনসার আহ্লাদের নিমিত্ত
হও তুমি মহাপ্রভু তোমাকে যে আসন দিয়েছেন
তার জন্য জগতের সমস্ত বিষকামনা জানাই
ধিক্কার জানিয়ে তোমার কর্মকে সাধারণ মানে
পৌছে দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে আমার জীবন
যাবে না আমার এখনও অনেক কিছু বাকি আমি
তো আর দেবব্রত ভীষ্ম নই যিনি দুর্যোধনের সকল
অপরাধ জানার পরেও বংশরক্ষায় কুরুপুত্রদের
জন্য শহীদ হয়েছিলেন------

ইতি
যতিজ্ঞানহীনএকপাপাত্মাযাকেতোমারসহ্যহবেনা

আগমনী

–সৌমিত্র আচার্য

খড় বিচালির কাঠামোতে কুমোর দিল মাটি;
ডাম-কুড়াকুড়,তাক-কুড়াকুড় ঢাকের পিঠে কাঠি।
শিউলি হাসে,শিশির ঘাসে,কাঁশের মেলা বনে,
মা আসছেন ঐ শোনা যায় বাউল ফকিরের গানে।
কেমন এ তোর মায়া মাগো দীন-হীন জনে,
সবাই মিলে জুটল যে আজ তোরই আবাহনে!
দীঘির জলে পদ্ম ফোঁটে,ধানের ক্ষেতে দোলা,
হঠাত এসে ধরা দিল রঙিন খুশির মেলা।
নীলাকাশের মেঘগুলো সব ভিনদেশে দেয় পাড়ি;
একটি বছর পরে যে মা আসছে বাপের বাড়ি।
গাঁয়ের বধু দিচ্ছে উলু,বাজছে কাসর-ঘণ্টা,
আলতা শাড়ির তরে আজ আনচান তার মনটা..
মণ্ডপেতে ঘুরবে রঙিন প্রজাপতির সাজে!
এসব ভেবেই দিন কেটে যায় মন বসেনা কাজে।
কঁচিকাচার ঠোটের কোনে মিষ্টি সরল হাসি,
এবার পূজোয় হবে নুতন জামা জুতো বাঁশি।
সবার মনে সাধ এবার হবে দেবী বোধন;
তাইতো মোদের পাড়াগাঁয়ে পূজোর আয়োজন।
ভক্তি ভরে পূজিব মোরা মায়ের চরনতল;
উপচারের সাধ্য নেই তাই দেব আঁখিজল।
শ্রদ্ধা ভরে এটুকু মোরা করব নিবেদন...
দীনহীন কাঙাল মাগো মোরা আর্তজন।
সবাই মিলে এটুকু আশিস মাগি করজোড়ে;
জ্ঞানের আলো জ্বালিস মা তুই মোদের কুঁড়েঘরে।
দুমুঠো রোজ পায় যেন মা খেতে মোদের শিশু
রাজভোগের সাধ নেই মা, চাইনা মা আর কিছু...
প্রতিবার আসবি মা তুই কাঙাল দুঃখীর দেশে;
সুখ শান্তির বার্তা নিয়ে ভুবন ভুলানো বেশে
বক্ষ মাঝে আসন পেতে রাখব তোকে তুলে,
মনের যতো শোক-দুঃখ, মান অভিমান ভুলে।।

করোনা

–দীনবন্ধু সেন

বছরখানেক হয়ে যাচ্ছে,
করোনা যে কমছে না।।
আসবে আসবে বলেও যেন
ভ্যাকসিনটা আর আসছে না।।
আইসোলেশন, ভেন্টিলেটর
লকডাউন আর নতুন কি?
কোয়ারেন্টাইন, কোভিড কেয়ার
নতুন করেই চিনেছি।।
স্যানিটাইজার,হ্যান্ডওয়াশ আর
থার্মাল স্ক্যানার কতো কি?
স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে গেলেও
পিপিই কীটটাই কার্যকরী।।
যতই থাকুক কাছের মানুষ
দূরত্বটা বজায় চাই।
স্বাস্থ্যবিধি মেনেও যেন
কোনোমতে রক্ষা পাই।।
অ্যান্টিজেন টেষ্ট দ্রুত হলেও
সোয়াব টেষ্টটাই দরকার।
করোনাকে রুখতে যেন
হিমশিম খাচ্ছে সরকার।।
ডাক্তার নার্স আর স্বাস্থ্যকর্মী
সবাই যখন ভগবান।
মহামারীর মাঝেও যেন
এক শ্রেণির লোক লাভবান।।
দিনে দিনে সংখ্যা বাড়ছে।
মৃত্যু বাড়ছে সাথে সাথে।
করোনাকে হারিয়েই যেন
মেতে উঠি একসাথে।।
জীবন যখন থমকে যাচ্ছে
কর্মচ্যুৎ দেশবাসী।
আশা তবুও ছাড়ছি না যে
আমরাই হাসবো শেষহাসি।।

উষ্ণতার অভিযোগ

–দেবজ্যোতি আচার্য্য

পৃথিবীটা আরেকটু উষ্ণ হতে পারতো..
উষ্ণ হতে পারতো অজুহাতের দাঁড়িপাল্লা
ছেঁড়া স্ট্রিংয়ে বাঁধানো সুর বার বার তালচ্যুত হয়
আঁচড়ে কমে স্বপ্নের অমরত্বের দাবি..
বসন্ত কমে আমার গানে
বাড়ে ক্লোরোফর্ম মাখা নিস্তব্দনা প্রতিটি
শিরাউপশিরায়.
কোনো অপরিচিত অভিযানে

পৃথিবীটা আরেকটু উষ্ণ হতে পারতো..
উষ্ণ হতে পারতো বড়োদের সহজে এডপ্ট করা দৃষ্টিভঙ্গি
আমি তার সিদ্ধান্তের প্রান্তে একশুকনো পাতা
তাই হটাৎ করে সানগ্লাসে বাড়ে চুখ
ঘুমের সেলামিতে
অপেক্ষায় কোনো সূর্যের মুখ..
পাখিদের কোলাহলে গুঁজে যায় আমার অস্তিরতা

পৃথিবীটা আরেকটু উষ্ণ হতে পারতো..
উষ্ণ হতে পারতো সিলেবাসে রাখা নিয়ম
আমার থালায় তখন নিন্দা এবং বৈরিতার
কুফলে ঠেকানো স্মৃতি
সাত বাই সাত কবরে নিঃশাস হারায়
প্রাচীর ভেদের অসফল ক্লান্ত চেষ্টায়
ক্যালেন্ডারের মাথা মুড়ায়
লোহার বর্বরতায় সে জলে ভাসে
নাবিকের কুন্ঠা শুনে সেও পাল তুলে
তাতে নাবিক মৃদুহাসে
এই পৃথিবীটা আরেকটু উষ্ণ হতে পারতো..

অবাস্তব

–দেবাশীষ দাস

বোবা চিন্তার ফসল
তুলি ঘরে।।
একদলা মাটি, ঘুনে ধরা কাঠ
আর কিছু অবাস্তব কল্পনা।।

এখন কালান্তর
নদীর জলে বিষ
মাঝিরা গেছে হারিয়ে
মাছেরা হাঁ করে গিলে ফেলে
গোটা পৃথিবী।।

মাটি ফেটে রক্ত ছুটে
আকাশ ঢেকে ফেলে ছাই
শুধু জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি
সারি সারি মৃত শরীর।।

এখন, ক্যানভাস ছুঁলে আগুন
কলমের কালি শেষ।
বিছানাও টানেনা কাছে
কোথায় বিক্রি করি এ শরীর ?

শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে

–শিউলি শর্মা

কাজ শেষ । ট্রেনে উঠে পড়লাম জানালার কাছে।
কি অদ্ভুত সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বিশাল বিশাল
কালো ঢেউ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে । মাঝে মাঝে
দু'একটি ইলেকট্রিকের পোস্ট ছড়ানো-ছিটানো ।
মোমের আলোর মতো ঘরবাড়ি। আমি যেন এসব
কিছুর উপর দিয়ে ছুটছি নতুন জন্মের দিকে।
শৈশব কৈশোর ছুটে যাচ্ছে ,এসেছে মোহময় যৌবন ।
আলোর প্রদীপ। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে সেগুলো,
ভুল ভুল ঘোরের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি ।
আকাশের পথ ধূসর এর থেকেও গাঢ়, আগে যারা
এসেছে তারা কোথায় ? এ জন্ম বিস্মৃতির মাঝে
চলে যাচ্ছে। হালকা পালকের মতো বাতাসের
গতিতে বয়ে যাচ্ছি, শব্দ নেই, নিঃশব্দের স্থিতি।
সুখ নেই, দুঃখ নেই, নেই হারানোর অনুভূতি।
ক্রমে এক সুদীর্ঘ অন্ধকার গ্রাস করছে। আমি
যতই এগুচ্ছি,আমার সব যেন নিরাময় হয়ে যাচ্ছে ।
কোন বোধ নেই । আমার নির্দিষ্ট কোন আধার নেই ।
পুরো বাতাসে মিশে যাচ্ছি । আমি মিশে ই গেলাম।
নিকষ বন । আমি যেন ঐবনের সবকিছু জানি ।
শরীর ও নেই, হাওয়া। সাগরে টুপ করে একফোটা
জল যেমন নিরুদ্দেশ, নিকষ কালো আঁধারে আমার
প্রাণের হাওয়াও হাওয়ায় নিঃশেষ।
আলাদা করে চিনি না । আমিত্ব নেই ,বহুত্বও নেই ।
এ যেন সৃষ্টি স্থিতির পর লয়।
ঘুম ঘুম সর্বব্যাপী ঘুম। এ ঘুমের শেষ নেই।

এক একটা জনপদ প্রথম পুঞ্জিভূত আলো।
তারপর কয়েকটা, শেষ হতে হতে গভীর একাকীত্ব ।
আবারো দু-একটা আলো। আবারো দু-একটা আলো, হালকা হতে গিয়ে ছোট এক দীপ।
আবার হালকা থেকে গাঢ় জনপদ । এক একটি স্তর পেরিয়ে চলেছি উৎসের দিকে। প্রাণের উৎস, আমার উৎসবের প্রাণ । মাঝখানে জয় গাঁথা, সফল অ-সফল সবই বৃথা, সত্য শুধু জীবনের জয়গান।
(আগরতলা থেকে মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে আকাশ দেখে এরকমই আমার মনে হতো প্রায়ই, তবু ধরতে পারলাম না তার পুরো রূপ।)

বিষাদগাথা
–নীলোৎপল গোস্বামী

হাঁটতে শিখে ছেড়েছি যাঁর হাত
দাঁড়িয়েছি যাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে,
ফোঁটাও তাঁকে করিনি যে সম্মান, এত বড়
মানবযুদ্ধজয়ে।।

জয়ী কি হয়েছি ? না পরাজয়ের গ্লানি
পান করেছি ভক্তিভরে
জঠরে স্বদেশে মা'কে পূজেও,
যাই দূরে সরে সরে।

তিনি কি চাইতেন রক্ত ঝরুক
তোমার আমার মনেদেহে
দোয়া-প্রার্থনা ছিল গহীন হৃদয়ে
গলিতসোনায় মেখে স্নেহে।

মাটিতে যেদিন আঁচড় পড়ল
বিভেদে ছিন্ন দেশ
লালন হাসান কাঁদে একদিকে
আজ গোলাম মেহেদী বিদেশ।।

ওহে মানুষ শোনো,
তোমার ধর্ম ইসলাম, তোমার ধর্ম হিন্দু ?
মায়ের কি আছে ধর্ম কোন ?
সন্তানবিহনে যিনি বিষাদসিন্ধু।

কাঁটাতারে শোণিত ঝরে প্রতিদিন
অশ্রুভরা শ্যামল আঁখি।
চেতনা আমার রবীন্দ্রনাথ,
নজরুল ভালবাসার রাখি।।

জীবন
–শিবানী পাল

জীবন রেখা সরল তো নয়
বক্র যে তার চলন।
হাসি -কান্না সুখ -দুঃখে
অন্তরেতে দহন।
বোবাকান্না আর আর্তনাদ
অবগুণ্ঠনে অদেখা।
গোগ্রাসে গিলছে বসে
জীবনের সরল রেখা।
পিছু যেন দিচ্ছে এক
অজানা হাতছানি।
মনে হয় তার হাতে আছে
ভালোবাসার ছোঁয়ানি।।
হিসেব-নিকেশ জীবনের
কাজ যে কঠিনতর।
গুণ ভাগের খাতার পাতায়
আছে মিলন মতান্তর।।
দূর প্রান্তরে সিঁদুরে মেঘ
রক্তিমতার আভায়।
সমান্তরাল কি হবে জীবন
যদি সোহাগ মাখানো যায়।।

জোড়া শালিক

–নীলাঞ্জনা দেবনাথ

ছোটো থেকে শুনে এসেছি দুই শালিক দেখলে দিন নাকি ভালো যায়। বড়ো দিদিরা বলতো যেখানে দুই শালিক দেখবি ঠাকুরের নাম করে মাথায় হাত ঠেকাবি দিন ভালো যাবে। সেই থেকে অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। রাস্তায় দুইটি শালিক দেখলে আমার হাতটা নিজে থেকেই যেনো কপাল ছুঁয়ে ফেলে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটি শালিক দেখলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আরেকটা দেখার জন্য। কোনো কারনে আরেকটা না দেখতে পেলে মনটা ভীষন খারাপ হয়ে যেতো। পরীক্ষার রেজাল্ট এর ক্ষেত্রে ও একই। একবার তো দুটো শালিকের দিকে তাকিয়ে প্রনাম করতে গিয়ে সাইকেল নিয়ে সোজা ড্রেনে ভাগ্যিস একজন কাকু টেনে তুলেছিলেন। সেদিন পা কেঁটে যাওযার থেকে ও বেশি দুঃখ হয়েছিলো যে কেনো দুটো শালিক দেখার পর ও এমন হলো। এই অঙ্ক আমার ছোটো মাথা কিছুতেই মেলাতে পারছিলো না। তার সমাধানের জন্য যখন পাশের বাড়ির দিদিকে বললাম সে বলেছিলো " দেখ এক কালারের এক ধরনের দুইটা শালিক দেখতে লাগবো একটা মোটা একটা রোগা হইলে হইতো না" ব্যাস এরপর থেকে শুরু হলো নতুন অভিযান।

যাই হোক দুই শালিকের কৃপায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে চলে গেলাম বাইরের রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানে মানুষের মুখ সপ্তাহে একবার ভালো করে দেখতে ভাগ্য লাগে আর শালিক তো দূরের কথা। তবু আমি আমার খোঁজ ছাড়ি নি। আমার এক বন্ধু আমার কথা শুনে হেসে বলতো "দক্ষিনী শালিক বাংলা কি করে বুঝবে!" দীর্ঘ ছয় বছর সেখানে কাঁটিয়ে আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। ততোদিনে বদলে গেছে আমার মফঃস্বল। গাড়ির আওয়াজ আর মানুষের তান্ডবে শালিক এর দেখা মেলে না।
এখন দুই শালিক ছাড়াই জীবনটা ইঁদুরদৌড়ে টুকটুক করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বেশ। গত আড়াই মাস ধরে ঘরে বন্দি থাকার পর সেদিন যখন চেম্বারে যাচ্ছিলাম দেখলাম পাঁচটা দুই শালিকের জোড়া। আনন্দে আবার দুটো হাত কপালে ঠেকালাম....না এবার কুসংস্কারে নয়, ক্ষমা চাইতে।....

* * * * *

সিন্ধুনদের দেশ

–অনিন্দিতা দেবনাথ

ফের আবার
যদি জন্মাতে পারি জীবন নিয়ে
খুঁজবো এশিয়ার ভারতবর্ষকে ।

সেই ভারতবর্ষ
যার উৎপত্তি চন্দ্রবংশীয় রাজা
ভরতকে নিয়ে ।

তখন হয়তো ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক
আরও উন্নত হবে,
ইতিহাসের বইগুলো
আরও মোটা হবে,
কিন্তু হিন্দুস্থান ?
শব্দটা অপরিবর্তনীয় ।

এই ভূমিতে
এখনও বিহানবেলায়
দুধের গ্লাস নিয়ে
মা বলেন -' খেয়ে নে ' ।
এখনও জিজ্ঞেস করেন
মশারিটা ঠিকঠাক আছে কিনা !
খোকার গা-পোড়া জ্বরে
এখনও জলপটি দেয়া হয় ।

এখানে এখনও বসন্ত আসে
উঠোনে পাকাধান
জমিতে দু-একটা ঘাস ফড়িং
আর চাষির বুকে
সফলতার স্পন্দন ।

পৃথিবীর সকল সুখকে
একত্রে মনভরে উপভোগ করবো আমি ।

আমার যদি জন্ম হয় কাশ্মীরে,
বাল্যকাল কাটবে গুজরাটে
যৌবন নাগাল্যান্ড,
বার্ধক্য কোচি,
আর মৃত্যুটা ভারত মহাসাগরের উপরেই
ছেড়ে দিলাম ।
প্রাচীন গ্রীকদের ভাষায়
আমি একজন ইন্দোই ।
আর একজন ইন্দোই হিসেবে
হিন্দুস্থানের জন্য
আরও একটি জীবন
উপহার চাই ।

ইম্প্রেশন্

–পলাশ মালাকার

আড়াল করে লাল
পানের পিক্,
দাঁত ভাবে, "আমি সাদা
চিক্ চিক্"।

মন ভাবে–
মুখ ভারী সুন্দর।
চোখ বুজে
মনে হয়, নির্ভীক।

শুধুই বিদ্রোহী নও

–সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

তোমাকে সবাই 'বিদ্রোহী' নামে চেনে;
প্রেমের পরশখানি দিয়ে তুমি যে মুন্সিয়ানা বেঁধেছিলে-
সে'সব কথা- গানের বুলি তারা আওড়ায় ঠিকই,
তবুও তোমায় তারা শুধুই 'বিদ্রোহী' নামেই চেনে;

যে প্রেমের বাঁধনে এপার - ওপার বাংলায় মৈত্রী'র
সেতু গড়েছিলে,
যে প্রেমের বাঁধনে মন্দির- মসজিদ এক করেছিলে,
তার কথা লোকমুখে শুধুই 'বিদ্রোহী-রণসম' ঠেকে ।

গুলবাগিচার প্রেমমুক্তো কুঁড়িয়ে সুরবাণীর যে
মাল্যহার বানালে-
ধূমকেতুর তপ্ততা'কে প্রেয়সীর খোঁপার আলগা
বাঁধনে যে রক্তিম গোলাপ করে সাজালে -
বিনোদবেণীর আড়াই প্যাঁচে যে ভালোবাসার কথা
খুব সহজেই বলেছিলে -

নাহ্ ! তবুও সকলের মনে তোমার বীণা শুধুই
অগ্নিতপ্তসম,
তবুও সকলের কানে তোমার বাঁশি শুধুই বিষজ্বালাসম ;

তারা ভুলে যায় বারবার,
মানসিক বিকারে স্মৃতিভ্রষ্ট তুমি কি দারুণ
প্রেমরসের'ও প্রতীক !
কোনো প্রেমিক এখনও তোমার 'বিদ্রোহী'
তকমার গহন হতে লুক্কায়িত দু'কলি রসের
পদ্যাংশ তার প্রেয়সীকে উৎসর্গ করে,
এখনও সন্ধ্যামালতি তোমার গানের প্রতিলিপি হয়ে ফোটে,
এখনও সূর্যমুখী ফুলের মতোই তোমার প্রেমসম্ভার প্রকাশিত;

তবুও যারা শুধুই 'বিদ্রোহী' ব'লে চেনে তোমায়,
তাদের বলছি-
তুমি শুধু'ই 'বিদ্রোহী' ন'ও,
তুমি একাধারে 'প্রেমের ভক্তিকবি' ।।

পরিচয়ের সন্ধানে

–অনন্যা ভট্টাচার্য্য

নিন্দিত না হয়ে বরং নন্দিত হোক সেই ধর্ষক যে
হত্যা করে সদ্যজাত কিংবা সবে তরুণী সেই মেয়েদেরকে।
ভাগ্যিস মেয়েগুলি আর নেই।

তা-নাহলে কাঁদত ধর্ষিতা হাসত ধর্ষক সমাজও
ঠিক আঙুল দেখাতো তাদের,
ধর্ষকের বিচার না হয়ে চলতো ধর্ষিতা নিয়ে বিনোদন,
কখনো থানা কখনো হাসপাতাল, কখনো আবার
আদালতে হতো ধর্ষনের কাহিনি কর্ষন।

রক্তাক্ত মেয়েদের প্রতি কৌতুহলের থাকতনা শেষ,
কোথায় দিয়েছে কামড়, কোথায় পড়েছে চুমু
এসব প্রশ্নের ঝড় উঠত বেশ।
যনি পথে চলতো অস্ত্র, নাম হতো বীর্জ শনাক্তকরন,
medical test এর নামে দেহে জাগত পুনরায় ধর্ষনের শিহোরন।

তারপর শুরু বিচার,
উকিলের বাক্যবান, সাংবাদিকের মজাদার প্রশ্ন,
মানসিক ধর্ষনে তাদের ভাঙতো সব স্বপ্ন।

আর শেষে সব কাটিয়ে তারা যখন স্বাভাবিক
হওয়ার চেষ্টায়,
সমাজ তখন আঙুল দিয়ে এদের ধর্ষিতা বলেই চেনায়।

"মৃত্যুর পর একটি দেহের পরিচয় যেমন লাশ,
ঠিক তেমনি ধর্ষনের পর একটি মেয়ের পরিচয় ধর্ষিতা।"
তাই, ভাগ্যিস মেয়েগুলি আর নেই।

নীল সরোবর

–সুস্মিতা নাথ (সুমন)

হাঁফাতে হাঁফাতে মিনু এসে বলে, আচ্ছা মামনি কেন আসো তুমি এখানে ? কী পাও এই সরোবরে, একা এতটা পথ হেঁটে আসো ভয় করে না তোমার?? প্রতি সপ্তাহের এই দিনটিতে মামনি এসে এখানে বসেন। মামনি সত্তর ছুই ছুই এক বৃদ্ধা। তিনকোলে কেউ আছে বলতে, এক ছেলে, বিদেশে থাকে। ছেলে চলে যাওয়ার পর তিনি প্রায় পনের বছর ধরে, এই গ্রামে ছোট একটি গানের স্কুল করেন আর এখানেই থেকে যান। শহর থেকে অনেক দূরে। গ্রামের ছোটো ছেলে মেয়েদের গান শিখাতেন, ---- এখন আর পারেন না, মিনু উনার খুব প্রিয় ছাত্রী, ও ই দেখাশোনা করে স্কুলটি, সেইসাথে মামনি কেও।। গ্রামের সকলেই উনাকে মামনি বলে ডাকে,সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা করে। আর উনিও স্নেহের বন্ধনে সকলকেই বেঁধে রেখেছেন। ত্রিশ অনূর্ধ্ব মিনু, সে তো মামনি বলতে অজ্ঞান। চোখের আড়াল করতে চায়না।–মামনি বলেন, তুইবা কেন এই গরমে এতটা পথ আসতে গেলি ?

হয়েছে আমার জন্য আর আদর দেখাতে হবে না। সূর্য ডুবতে চলছে, মোবাইলটাও সাথে করে আনবে না, লেন্ডফোনের মতো বিছানার পাশে রাখা থাকবে। এতটা পথ অন্ধকারে যাবে কি করে ? ভেবেছ ?

কেন ভাবিসরে আমার কথা, কেন ই বা এতটা ভালোবাসিস, আমি কে হই তোর??

মিনু ছলছল চোখে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল----- এসব কথা আর কোনো দিন বলনা মামনি। একথার কোন উত্তর আমার জানা নাই। থাক এসব ---- শুনো, সৌরভ এসেছে, তোমার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। জানোতো! ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের দিন ঠিক হল। আমি কিন্তু ওকে বলে দিয়েছি, ---- গানের স্কুল আর তুমি কোনোটাই আমি ছাড়তে পারবনা। সেও রাজি।

তুই আছিস বলেই স্কুল নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু আমাকে ছাড়বিনা মানে ------ ? আমি আর কতকাল -----

মামনি আজ একটি কথা তোমাকে বলতেই হবে ---- কেন তুমি এখানে এসে একা বসে থাকো,কী ভাব বলোনা।

তবে শুন ----- বলতেই সৌরভ এসে ওদের পাশে বসে পড়ল, আর বললো এতদূর, গ্রামের মাটির পথ দিয়ে তুমি কি করে আসো মামনি ?

কেন আসি বা কি করে আসি, আর কিসের টানে আসি -- বলছি শুনো ---------------

'নিতা' আমার সহপাঠী। একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে পড়াশোনা, খেলাধুলা, অথাৎ বড় হয়ে উঠা। নিতা খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইত। আমি যে আজ

জীবনের এতটা সময় গানের স্কুল, বা গানবাজনা নিয়ে কাটালাম, তার পুরোটাই নিতার সুবাদে। ওই আমার গানের প্রথম গুরু, ওর হাতেই আমার গানের হাতেখড়ি। আজও মনে পড়ে 'এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে" বাহির হয়ে এসো তুমি, যে আছো অন্তরে'

এই বলে একটু থেমে গেলেন মামনি -------------

তারপর কি হল বলনা।

বলছি, ---------------সেই সময় গানবাজনা, পড়াশোনা নিয়ে ভালোই ছিলাম। যথাসময়ে প্রত্যেকের বিয়ে হল, কিন্তু সংসার করাটা ওর হয়ে উঠলোনা। বিয়ের সাত বছর পরেও যখন কোনোও সন্তান হলনা, তখন নিতা নিজেই ওর স্বামীকে ছেড়ে চলে এল, বাবার বাড়ি। দু- চারটে বাচ্চাকে গান শেখাত, কিন্তু এটাও হলনা। ও কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কখনো ঠিকঠাক বলত, আবার কখনো অগোছালো । আমি এই গ্রামে আসার সাত আট বছর পর,ও একবার এসে, কদিন থেকে যায়। সবকিছু মোটামুটি ঠিক ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে অনেক ঘোরাঘুরি করি। এরমধ্যে একদিন এই সরোবরে আসি, কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করি। নিতার সাথেই প্রথম আমি এখানে আসি। সারাজীবন শহরে থেকেছি, এতবড় স্বচ্ছ লীল জলের সরোবর কখনো দেখিনি।

এজন্যই এখানে আস তুমি মামনি ?

একটু আড়ষ্ট স্বরে, না, বলছি --------------

নিতা অন্যমনস্ক হয়ে প্রায়ই একটি কথা বলতো ----- "আমাকে চাঁদ- সূর্য্য, আকাশ, পাহাড়, গাছপালা একসাথে কাছে ডাকে, কাকে রেখে কার ডাকে সাড়া দেই ভাবছি।" একথার কোনো অর্থ বুঝিনি , আসলে বুঝতে চাইনি। আজ বুঝলাম।

কী বুঝলে -----------??

নিতা এখান থেকে যাওয়ার বছর খানেক পর, তুই সবে ডিগ্রি শেষ করে গানের স্কুল জয়েন করলি, আমি চলে গেলাম কলকাতা বেলুড় মঠ। মাসখানেক থেকে আসলাম। তোর মনে নেই? হ্যাঁ , আছে তো। কিন্তু তার সাথে এর কি যোগাযোগ ?

যোগাযোগ অন্য যায়গায়, বলছি। এসে দেখলাম দৈনিক পত্রিকা গুলি তুই খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিস। জানিস তো শব্দছক মিলানো আমার অভ্যাস। সেটা করতেই পুরানো পত্রিকা গুলি নিয়ে বসি। তখনই দেখি নিতার ছবিসহ একটি খবর। ও আত্মহত্যা করেছে, আর এই সরোবরে। নিতা কেন এখানে এসে আত্মহত্যা করল ? তার উত্তর খুজতেই এখানে আসি। আজ তা পেলাম।

কি পেলে ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনু আর সৌরভ একসাথে বলে উঠলো।

তোরা এই সরোবরের জলের দিকে তাকিয়ে দেখ,কি দেখছিস ?

কি দেখব ? জল ---- একেবারে স্বচ্ছ, যেন নীল সরোবর।

আমিও এতদিন তা দেখতাম। আজ দেখলাম --------- এই সরোবরে দেখা যায় ---

পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের অস্ত যাওয়া, আকাশে চাঁদ উঠা, পূর্বদিকের পাহাড়, আশেপাশের সব গাছপালার প্রতিবিম্ব।
নিতা যে বলত পাহাড়, সূর্য্য, চাঁদ, ওকে একসাথে ডাকে, কাকে ছেড়ে কার কাছে যাবে ? এই সরোবরেই ও সবকিছু একসাথে পেয়েছিল। তাই নিতা এখানেই ওর শেষ নিঃশ্বাসটা --------------------।
এই বলে মামনি চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বললো না।
মামনি এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যা নামলো বলে, বাকিটা না হয় যেতে যেতে বলো।
নারে আর কিছু বলার নেই।
একটা গান কর।
কোনটা বলো ?
রবীন্দ্রসংগীত কর।
"তোমারো অসীমে প্রানমনো লয়ে, যতদূরে আমি ধাই,
কোথাও দূঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই" ।

করছি, তবে তুমিও গাও মামনি।।।

করোনার করুণা

–স্বপন ধর

হায় রে করোনা
তোর করুণার হিসেব কেন রাখিস না।
জাতের পাল্লায় অঙ্ক কষছে জাতি,
একি সেই যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রজাতি।
রেখায় যখন কাটাকুটি খেলছে মরনের অভিলাষা,
একপা তোর স্বর্গে আরেক পা নরকে
এ কেমন বিলাসা।
তোর রূপের আঘাতে সংখ্যায় লেগেছে আশংকা,
তারাই তো ভগবান যার গলায় বাজছে বিজয়ের ঢঙ্কা।
পথে হাঁটছিস হাঁট, দেখবো আরও কতদূর
মনে রাখিস,
সেই জাতির ঘাড়েই তোর দম্ভের হবে চুর।।

তোমার বাড়ি

—শম্ভু শংকর চক্রবর্তী।

নানা থাক সেই ভালো,
নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয় আমার কথা,
টেনে দিয় কাচের পর্দা
সেদিন তোমার বাড়ি আর ফিরব না।

ঝড়ো হাওয়া সাথে ঝাপসা রাত্রি,
ডাকবে কি আমায় ? এইটুকুই আর্তি
ফিরে ফিরে তাকিয়েছি বহুবার,
নাকচ তোমার হাতেই জানি,
হয়তো তোমার বাড়ি আর ফিরব না।
সাগরের জলে হাতড়ে বেড়াই
কাগজের নৌকা হয়ে
ফিরতি পথ বোধহয় আর জানিনা,
যদিও বা দুঃখ পেলেও আসব ঠিকই
বার বার হয়ে তোমারই বোহেমিয়ান।
ফিরে যেতে বলো যদি আবার
তবে আর থামব না,
কথা দাও গুছিয়ে নেবে ,
সেদিন হয়তো তোমার বাড়ি আর ফিরব না।

ধৈর্য্যই সুখের চাবি

—মম্পি দে

হিমাদ্রি তুমি কেমন কবে
শিখাও জ্ঞানের পাঠ যে।
দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে আছ
নেই তোমার কোন ক্লান্তি যে।
তুমায় দেখিয়ে জ্ঞান বাটছি
শিখছি না কিছুই নিজে যে।
ধৈর্য্য তোমার শিরায় শিরায়
ভাঙ্গে না ধৈর্য্যের বাঁধ যে।
ঝড় তুফান রোদ্রানল
সবই তোমার সহ্যর।
আমরা কেন দুর্বল চিত্তে
মরার আগে মরি রে।
কেনো অভিশপ্ত জীবনটার
বিদায়ের দিন গুনছে রে
কেউ আবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে
যমকে আপন করছে রে।
দুঃখ তুমি আজকের অতিথি
সুখ না হয় কাল আসবে রে।
তাই বলে কি শেষ দেখার -
আগে নিজেকে শেষ করব রে।

করোনা কবলে আমরা

–রিয়া পাল

-আচ্ছা দিভাই আমার যে আর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছে না। কতদিন হয়ে গেল স্কুলে যাইনি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

-মন খারাপ করিসনা। আমরা সবাই মোটামুটি বাড়িতে। কেউ তো বেরোতে পারছি না। বাড়িতে বসে কাজ করছি।

-না না তবু আমার মন খারাপ। কতদিন হয়ে গেল কোথাও ঘুরতে যাইনি।

-তাও তো আমরা সুখে আছি। ওইটুকু কষ্ট তো কম বেশি সবার হচ্ছে।
ভাবতো যারা হসপিটালে নিজেদের জীবন বাজি রেখে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে আমাদের সুস্থ রাখার জন্য।
কত মানুষ কাজ হারিয়ে বসে আছে। দুবেলা দুমুঠো খেতে পর্যন্ত পারছে না।
কত মানুষের বাড়ি ফিরতে গিয়ে না খেতে পেয়ে , পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো।
কত নিষ্পাপ শিশু মা বাবা বাড়ি ফেরার আশায় বুক বাধছে তাদের কষ্টটা আমাদের তুচ্ছ কষ্টের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান।

আজ এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আমরা শুধু নিজেদের খারাপ লাগা গুলোকেই এতটা প্রাধান্য দিই যে এত বড় ঘটনাগুলো যেন কিছুই না।

-দিভাই তোর কথা শুনে ভালো লাগলো রে।
আচ্ছা আমরা পারি না ওদেরকে নিজেদের সামর্থ্য মতো সাহায্য করতে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারি। শুধু আমাদের ইচ্ছেটুকু দরকার।

* * * *

আমার দুর্গা

–দেবজ্যোতি দাস

ঘরে ঘরে চাঁদা নিতে ছেলেদের দল বেড়িয়ে পড়েছে।
সকালের সোনালী রোদ্দুর আর সন্ধ্যা বেলায় শিউলি ফুলের ঘ্রাণ,
গলির মোড়ে বাঁশ বাঁধা চলছে।
বান্ধবীদের সাথে টিউশনের ঘন্টা খানেক আলোচনার পর ঠিক হয়েছে,
রাই ও তার বান্ধবীরা নবমীতে সারি পড়বে।
সারির আবদার বাবার কাছে রাখার অপেক্ষা মাত্র।
বাবার এই পূজোর কিছু দিন বাড়ি ফিরতে রাত হয় বেশ,
এই কিছু দিন ই তো সেই ছোট্ট চুড়ির দোকানে রোজগার,
বাকি বছর তো শেষ।
বাবা বাড়ি ফিরতেই রাই বলে ওঠল,
"নবমীতে আমার সারি চাই এবার!"
ক্লান্ত মুখে হাসি নিয়ে বাবা মাথা নুইয়ে ভাত খেতে বসলেন।
কোন বাবার কি মন হয় তার রাজকন্যাকে ফিরিয়ে দেবার ?
রাই কোনো উত্তর না পেয়ে ঘূমিয়ে পড়ল অভিমানে,
হঠাৎ রাতে ঘুম ভাঙতেই গল্প শুনে কানে কানে,
বাবা মাকে বলছেন ডেকে
"আমিতো পুজোয় সময়ই পাই না, তোমাদের সাথে কি আর বেরোতে
পারি ?
আমার কাপড় এবার থাক ,
রাই-র জন্য নিয়ে নিও একটি ভালো সারি।"
কথা শেষে দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে গেলো রাই,
"বাবার সকল কমদামি সখ,
আমার দামি তাই।"
পরের দিন টিউশনের আড্ডায় হেসে বলল,
"আমি এবার পড়ছি নারে সারি।"
এভাবেই জন্মিল আরেক দুর্গা।
জন্মিল আরেক নারী।

* * * *

ইচ্ছে করে

–পঞ্চতপা দেব

ইচ্ছে করে
ওই দূরের আকাশ কোথায় শেষ হয়,
প্রজাপতির ডানায় চড়ে শেষটা খুঁজে আসি।

সকালবেলার সূর্য টাকে ব্যাগে ভরে
তার রংটা খানিকটা বদলে দিই।

আবার পাখির ডানায় পালক প্রশ্ন আনে, উড়ব কবে
কত বড়ো ডানা-ই না চাই আমার।

ইচ্ছে করে
ওই পুরোনো পাতাটা উল্টে দিই
দৌড়ে গিয়ে পুরোনো দিনে, নিজের মনটাকে পাল্টে
দিই।

স্ট্রীটলাইট আর ছোট্ট বেলার পাঠ,
ইচ্ছে করে আমিও বিদ্যাসাগর হই।

মায়ের আঁচল ধরে সব আবদার আবার
ইচ্ছে পূরণের ভার আবার না হয় মায়ের কাঁধেই
চাপিয়ে দিই।

নারী

–দেবজিৎ চৌধুরী

নারী তুমি শক্তির রূপ
তুমি নয় কো শিকলে বাধা,
তুমি হলে গর্ভ ধারিণী
ত্যাগের চরম পরিসিমা।।
নারী তুমি সমুদ্র
বিশাল তোমার মন,
পুরুষতন্ত্রের বেরাজালে
হবেনা তুমি ম্লান।।
নারী তুমি পণ্য নও
তুমি হলে সৌভাগ্য,
বাপের ঘরে লক্ষি তুমি
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।।

কল্পনার বাস্তববাদী

–বৈশালী দাস

শব্দের জন্মের আগে কবিরা যে সুরে ছন্দ মেলাতো
শুধুমাত্র ওইটুকু শিখবো;
ভালোবাসার জন্মের আগে সজীবদের প্রাণের
স্পন্দন কেবল শুনবো;
আঁধারের জন্মের আগের কালো রঙ দিয়ে কিছু
জলছবি আঁকবো;
মেঘেদের জন্মের আগের বৃষ্টিতে কয়েক যুগ ধরে
ভিজবো;
সৃষ্টির জন্মের আগের সভ্যতায় একটু জিরিয়ে
নিয়ে সবশেষে,
মনুষ্যত্বের মৃত্যুর আগের মানবিকতার রূপ
দেখবো।

বিনোদন

–মিস্মিতা দাস

প্রথম দিনের প্রথম দেখায়–
প্রথম নববর্ষের নব আলোয়।
হৃদয়ে থেমে থাকা প্রতীক্ষার অনুভব
আজ ভাষাতে প্রকাশ পাওয়া।
চাইনিস্ ম্যাক্সিকান থেকে ভিয়েতনাম
কুইজিনে নিয়ে একই ভালো লাগার টান।
সোনালী বাংলা থেকে–
সবুজে, ঘেরা পাহাড়ীয়া ছোট শহর
এঁকে দিলে সাত রং-এর পথ।
স্বপ্ন ছিল যা, তা আজ সত্যি হল।
রাঙ্গা মহাকাশ।
তাই শক্ত হাতে ধরতে চাই তোমারই হাত।
আবারও বলি;
ভালো বাসা তোমার সেই হাসি।
যেন এক তানপুরার সুর।
তাই, ভালোবাসি তোমার হাসি।

সাধারণ মেয়ে

–ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী

সরলতা, নম্রতা প্রকাশ পায় যাদের আভূষণে
মনে রেখো, জটিলতা দমন, বিনাশী রূপ আছে
তাদের শক্তিতে।
কাছের মানুষকে আগলে রাখে যত যত্নে
তেমনই লুকোনো রূপ প্রকাশিত হয় অন্যায়ে
প্রতিবাদে !!
আধপেটা খেয়ে, রৌদ্রে গা পুড়িয়ে সংসারের
যেই রূপে হাল ধরে –
তেমনিই স্বামী-শাশুড়ির অন্যায়ের প্রতিবাদেও
রুখে দাঁড়ায় সে !!
দশ মাস দশ দিন গর্ভ ধারণ করে, নানা বাধা সহ্য করে
ছেলেকে মানুষ করে –
তেমনিই পরিণত ছেলে বৃদ্ধা মাকে ঘরের বাইরে বের করে দিলেও
ছেলের প্রতি এতটুকুও স্নেহ কমে না যে !!
বড্ড অবলা, সাধারণ হলেও এই স্নেহময়ী নারী
চরম সহ্যক্ষমতা, প্রতিবাদী শক্তির অধিকারী !!
যেমনটি "মা দূর্গা" - দশ হাতে অসুর বধে সমর্থ।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও এই নারী সমান সম্মান ও–
অধিকারের যোগ্য।

উদাসী প্রভাত

–কানন দাশগুপ্তা সোম

মেঘলা মন ভরে থাকা শরতের
নীল পেয়ালায়,
ছড়িয়ে আছে, বসন্ত বাতাসের
পাপড়ি উজ্জ্বল আশায়।
বাতাসের রং মেখে রঙিন পাতা
ঝরে টুপটাপ,
সবুজ আকাশে ছায়া যেন কায়া
হয় প্রলাপ আলাপ।
অভিমানে রাতে বনের মেয়ে
কাঁদে,
তাহারি কামনা উদাস প্রাতে।।

প্রথম প্রকাশ

–বেবি শর্মা

প্রিয় মা,

কেমন আছো ? আশা করি ভালোই আছো। তোমাকে নিয়ে আমার দোলাচল ভাবনার আজ কিন্তু মূর্তিমান, প্রতিচ্ছবি তোমারই সামনে তুলে ধরলাম। সে প্রতিচ্ছবি আমার ভাবনার অখন্ড তুলির প্রকাশ্য আবেগ।

জীবনে উপরি পাওনাটাকে তো কেউ কোনোদিন হিসাব করে না, তাই আমিও আর করলাম না। তোমাকে আমি আমার জন্মগত অধিকার বলেই জেনে এসেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য কোনোদিন কোনো লড়াইও করতে হয়নি আমাকে। কঠিন সাধনার বস্তু হিসেবে আমরা 'প্রেম'কেই মূল্য দিয়েছি। কত আবেগের ঝড় তুলেছি, কত অভিসারে নেমেছি, কত প্রদীপ অকালেই নিভে গেছে কিন্তু কোনোদিন তোমায় নিয়ে কেউ ভাবেনি। আমার এই বিলাসিতার মর্মবেদনাখানি তোমাকে ঘিরে নয় সুতরাং তুমি আজও অবহেলিত 'মা'।

কিন্তু তুমিই তো আমার একান্ত আপন নিভৃত নিকুঞ্জ গহীনে সুরের তান; তুমিই হয়ত আমার সেই অদ্বিতীয়, যাকে আমি প্রতিদিন খুঁজি। জানো তো মা, আমি একা পরিপূর্ণ নই; আমার আমি আজও তোমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। মা গো, আমার বিলাসিতার, আমার আনন্দের, আমার অফুরন্ত সীমাহীন চঞ্চল প্রাণের 'স্পন্দন' 'তুমি'।

তুমি দেখিয়েছ আলোর পৃথিবী সে দেখিয়েছে কঠিন অন্ধকার সত্য মরুভূমি দুই-এ মিলে শূন্য আমি এখানেই আমি পূর্ণ।

আমি যেন তোমাতেই মিলায়ে যাই এই মোর বাসনা।

ইতি-

তোমার নীলাঞ্জনা

অদ্ভুত

–সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য্য

আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল, জীবনের একটু হিসেব নিকেশ করতে-
প্রতিযোগিতার মোহে ছুটতে ছুটতে-
জীবনকে মেশিন বানিয়ে ফেলা আধুনিক মানুষ আমরা।
গগনচুম্বী স্বপ্নের তাড়নায় আকাশ ছোঁয়ার লোভে
মাটি থেকে দূরে সরে যাওয়া ছিন্নমূল আমরা।
আরও, আরও বেশী পাওয়ার আগ্রহে
জীবনের শান্তিবেশী বিসর্জন দেওয়া ভিখারী আমরা।
ঠকে গিয়ে প্রতারণার যন্ত্রণায় flirting এর নামে
ভালোবাসার গলা টিপে হত্যা করা পাপি আমরা।
কারোর কাছে আসাকে 'বোঝা' আর দূরে সরে যাওয়াকে 'পরাজয়'
এই ভাবনায় মোড়া অহঙ্কারী মানুষ আমরা।
নিজেকে আড়াল করে জটিলতার নাম দিয়ে -
একাকিত্বের চাঁদকের ভাঁজে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া কলঙ্কিত মানুষ আমরা।
কৃত্রিমতা, আত্মঅভিমানের কালে জড়িয়ে
সুন্দর, সজীব জীবনকে ফিরে পেতে ব্যর্থ মানুষ আমরা।

কোভিড-১৯

–সুকান্ত দাস

আমরা বাস করি একবিংশ শতাব্দীতে
তাইতো মনে হয়েছিল,
বিজ্ঞান হয়তো সবকিছুকে রুখে দিতে পারে।
কিন্তু না !
করোনা যখনা দিয়েছিল হানা;
তখন বিশ্বাস হয়েছিল
বিজ্ঞানের এখনো অনেক কিছু অজানা

করোনা যখন চীনে দিয়েছিল হানা
সমগ্র বিশ্ব তখন মনে করেছিল, তা আমাদের হবে না
আমেরিকাও পড়ল যখন এর কবলে
ইতালি ও স্পেন চলছিল মৃত্যু মিছিলে,
ভারতবর্ষ তখনও ছিল করোনা মুক্ত
তখন আমরা মানিনি সামাজিক দূরত্ব
তাইতো আজ আমরা আক্রান্তে দ্বিতীয়
খুব দেরী নয় হয়তো মৃত্যুতেও হব অদ্বিতীয়।

এইজন্য এখন সবাই তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানের দিকে
রাশিয়া নাকি ইংল্যান্ড বাঁচাবে মানবজাতিকে।

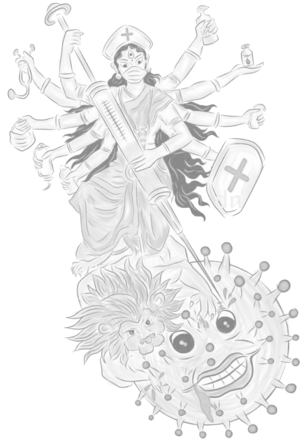

আকুতি

–তপা কর

ওগো মা,
বলছি তোমায় শোনো
নিদারুণ কত পরিস্থিতি বলছি তোমায়
তুমি শুধু গুনো।
প্রতিদিন যে সূর্য উঠে কত ঝলমলিয়ে
দিনের শেষে যায় তা
মলিনতায় ভরিয়ে,
এই যে সুখ, এই দুঃখ
এই যে আশা, এই নিরাশা
জীবন তাই বিভ্রান্ত
সকল পথিক পথ হারিয়ে আজ যে শুধু ক্লান্ত,
ওগো মা,
বলছি তোমায় তুমি শুধু শোনো।
বছর পরে আসছো মাগো
চারিদিকে শুধু উৎফুল্লতার শিহরণ,
বিষাদ সরিয়ে আানন্দ কেন মাগো,
করছে না আমাদের বরণ ?
বলো মাগো, ধৈর্য্য আর মনোবলের কত পরীক্ষা বাকি,
নাকি অজান্তে দিয়েছি তাতেও কোনও ফাঁকি ?
মাগো, বছর পরে তোমার আগমন
রেখেছি তাই আশা, জানি তুমি
খুশির আলোয় ভরিয়ে দেবে সবার মন।

নীলঘড়ি

–লিটন শব্দকর

সুসময়ের পথ চেয়ে জীবন
নিজেই যখন বলে
আমার হাঁটা হলো কই
সবটুকু দিনের ভেতর
ভারসাম্য হাঁতড়ে আংটি না পেলে
আটকে থাকে পরিণয়
আমারও বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ
নীল - কবির আক্ষেপ
তোমার নয় !!
সত্যিই কেউ কথা রাখেনি
হে প্রণম্য, একদিন পঙক্তি থাকে-
-কিনা জানিনা,
তবু রোজ আঁকিবুঁকি,
তারপর আমার চোখ-
সুন্দর নীল অথবা নীরাকে দেখবে-
-কিনা জানিনা,
শুধু ভালোবাসায় দেখা
আর ঋণী
শুধু এতটুকু জানি
দিন যেতে যেতে
আসলে কেউ কথা রাখেনা

পৃথকীকরণ

–সঞ্চয়িতা নাথ

মায়াবী প্রকৃতির অন্তহীন তপস্যার বিমুগ্ধ চিত্র
গতিময় পৃথিবীর বুকে চিরন্তন বৈচিত্র্যের শোভা।
স্বচ্ছ সলিলে জলরাশিতে বয়ে যায় কত সাগর, নদী-মহানদী
এপার ওপার অবিরাম সমান্তরাল বাহুর সূত্র সংলাপে,
আনমনা ভাবনায় নদী তীরে কৌতূহলী প্রাণের সঞ্চার.....
কিনারা দুটি ছুঁতে চায় একে ওপরের উষ্ণ নিঃশ্বাস,
নিবিড় আলিঙ্গনে বিলীন হওয়ার উন্মাদনায় দুর্বার গতি–
কখনো কাঠ ফাটা রোদ, কখনো বর্ষার প্লাবিত ধারা।
একূল ওকূল এক সূতোয় বাঁধা পড়ার দৃঢ় সংকল্পে
কত রাত কত দিন যেন শতাব্দীর দীর্ঘ প্রচেষ্টা,
একে অন্যের মাঝে হারিয়ে যেতে ছুটছে কত পথ–
হাজার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্তি-অবসাদ
তবু বিরামহীন পায়ে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার বিলাপ।
পথে যদি কোথাও সরু বাঁক-দুটি তীর বাড়ায় তার হাত–
অকস্মাৎ গুরু গম্ভীর গর্জনে ঘন বর্ষণ নয়তো
নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা সুশৃঙ্খল শব্দমালার প্রতিধ্বনি
তৃষ্ণার্ত নদী তীরের কাব্যিক প্রয়াসকে করে খন্ড খন্ড,
ঐকান্তিক স্বপ্নসম্ভারে যোগাযোগ উপলব্ধির মোহ মায়ায়
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভবে গড়ে তারা কৃত্রিম সেতু–
প্রবহমান বাতাসের কাদা জলে ধুয়ে যায় সেই সংযোগ স্তম্ভ,
প্রবল বন্যার তীব্র আলোড়নে প্রশস্ত ডানায় জাগে বিস্তীর্ন নদী ....
বিপুল জলরাশির ঐক্যতানে এপার ওপার যেন দিগন্তের ঐপারে,
একূল ওকূল বিচ্ছেদে করে কত কান্না– কে রাখে তার হিসেব !
এক যুগ প্রচেষ্টার কর্ম অভিমান বুকে নিয়ে একদিন তারা
অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির চিরাচরিত অনুশাসনে মানে হায়,
চিরন্তন ছন্দের জোয়ারে নিজ নিজ কক্ষপথে অবিচল নদীতট
পাথর নুড়ি ধূলিকণা সঞ্চয়ে গড়ে বালিয়াড়ি–
শস্য শ্যামল শোভায় বিস্তৃত উর্বর জমি।
দায়বদ্ধতার স্বর্তস্ফূর্ত অঙ্গীকারে শান্তির প্রতিচ্ছবি.....

মাতৃছায়ার প্রতিদান

—আশিষ দেবনাথ

প্রকৃতিরূপী ঈশ্বর থাকেন গভীর গহন বনে
সেথায় থাকে নিষ্পাপ পশু-পাখি, আনন্দিত মনে।
বনের শোভা বৃদ্ধি করে সকল পুষ্পদল,
রবির আলোয় চক্ চক্ করে বসন্তের নূতন কচি পত্রদল,
শতবছর পুরানো অশোক পিতা সবার আশ্রয়স্থল।
রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান যত সব অশনি সংকেত,
সব দূরে যায় অশোকের মাতৃসম ছায়ায়,
মায়ের মতো লালন-পালন করে সন্তানেরে।
সেই সন্তান আজকে মানবরূপী শ্রেষ্ঠ জীব
ধ্বংস খেলা খেলে প্রতিদিন।
বনস্পতি হারায় অস্তিত্ব মানবের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে
তাদের নির্দয় চরিত্রের ভীড়ে।
অন্ন-বস্ত্র বাসস্থান সবার উৎসস্থল
তবুও আমরা ধ্বংস করছি আমাদের গর্ভস্থল;
মায়ের মতো নিঃস্বার্থ বলিদান দিচ্ছে বনস্পতি
অবশেষে সন্তানরূপী মানবকূল অবলুপ্ত করছি, মা
বনস্পতিকে
চলো করি সংকল্প রক্ষা করবো সবুজ বসুন্ধরা,
সবাই মিলে প্রণাম করি মাতৃ চরণটা।

জন্মভূমিকে

—সেলিম মুস্তাফা

যত ঠিকানা লেখা সবই নিজের,
চিঠি ফিরে আসে নিজেরই কাছে, বিষন্ন
ক্লান্ত সব চিঠি !

চিঠির ভেতর খুব মূল্যবান নয়-
ঠিকানাও নয়,
তবু লেখা, আর
        চিঠিদের ফিরে ফিরে আসা !

গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে
সহসা মুখ তুলে আকাশকে দেখা

গাছেরা হয়তো
ঠারেঠুরে হাসেও কখনো,
শিকড়ে-বাকড়ে তাদের নিভৃত অনুভব-
কত চিঠি ঝরে যায় প্রতিদিন পাতায় পাতায়
প্রতিদিন
        আলো আর ছায়ার খেলা;

সব ক'টা চিঠি নিয়ে
একটা একটা কাগজের নৌকো
ভাসিয়ে দিলাম কুশিয়ারার জলে

নাও চলিল ঢেউ চলিল

সাহিত্যের রোমাঞ্চ

—দেবাত্র ভট্টাচার্য

আমি আজ উপন্যাস
তুমি আজ গল্প।
আমি আজ নাটক,
তুমি আজ কবিতা।
এভাবেই সৃষ্টি হয় কত কোলাহল
সাহিত্যের মাঝে লুকিয়ে থাকে
আনন্দের ছন্দ, অলংকার
মজার মজার ছন্দের ধারায়
সাহিত্যে সৃষ্ট হয় কত দ্বন্দ্ব।
দ্বন্দ্বের পথ ধরেই উদ্ভাসিত হয়
উপন্যাস, গল্প
তার-ই মাঝে ছন্দের আলোড়নে
উজ্জীবিত হয় নাটক, কবিতা।
সাহিত্যের বুকে এদেরকে নিয়ে চলতে থাকে
কত কবিপ্রাণ
কবিপ্রাণের দ্বারেই সাহিত্যে সৃষ্ট হয়
কত রোমাঞ্চকর।

জীবন ঃ যুদ্ধের জয়

–শেখর দেব

লক্ষীপুর গ্রামের বাসিন্দা। নির্মল তার মা বাবাকে নিয়ে বসবাস করত। নির্মল খুবই ছোট, বয়স তখন তার মাত্র ১১ (এগারো)। তার বাবা গ্রামের একটি চায়ের দোকানে চা বিক্রি করতেন, সাথে নির্মলও পড়াশুনার ফাঁকে বাবার কাজে হাত লাগাত। নির্মল'র বাবা খুবই মদ্যপান করতেন। চায়ের দোকান থেকে যা রোজগার হত তার বেশ অর্ধেক টাকা নির্মল'র বাবার মদ্যপানে চলে যেত। আর বাকি টাকা দিয়ে কোন রকম ভাবে ঘর-সংসার চালাত এবং পড়াশুনার খরচও। একদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে একজন পথিক তাকে বলল, "তোর বাবা ত রাস্তায় শুয়ে আছে রে"। জন্মদাতা বাবাকে ত আর ফেলে দেওয়া যায় না, দৌঁড়ে ছুটলো, গিয়ে দেখে তার বাবা আর বেঁচে নেই – মৃত।

মাত্র কয়েকদিন হল সে নতুন ক্লাসে উঠল। কী করে পড়বে ? আর সংসার-ই বা কীভাবে চালাবে ? তা নিয়ে একটি দুঃশ্চিন্তা তার মাথায় যেন পাহাড় জমাট বাঁধল। এক দুঃখ শেষ হতে না হতেই কয়েকদিন পর তার মা অন্য একজন পুরুষের সাথে বিয়ে করল। যা তার মনকে খুবই আঘাত করল। তখন সে ভাবতে লাগল– আমার এই পৃথিবীতে কেউ নেই - যখন আপন কেউ পর হয়ে যায়। সে ঠিক করল সে আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে দূরে কোথাও কাজের সন্ধানে অজানা এক দেশে।

সেখান থেকে শুরু হল তার নতুন জীবনের সন্ধান। প্রথম কয়েক দিন না খেয়ে, রাস্তায় শুয়ে দিন যাপন করতে লাগল। কিন্তু কথায় আছে না - বিধাতার লেখা কেউ খন্ডাতে পারে না। তখন হঠাৎ করে একজন লোক তাকে বলে উঠল, তুমি কী আমার সাথে কাজ করবে ? হ্যাঁ আমি কাজ করব। তখন ঐ লোকটি তাকে তার গাড়ির গ্যারেজে নিয়ে গেল এবং তাকে বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে মাসিক ২০০ (দুশো) টাকা বেতনের ব্যবস্থা করে দিল। এমন করে তার কয়েক বছর পার হয়ে গেল, হাতের কাজও প্রায় শিখে ফেলল। সে তখন মাসিক ৫-৬ হাজার টাকা রোজগার করতে লাগল যখন তার বয়স মাত্র ১৭, আমাদের ভারতবর্ষে তখন তার ভোট দেওয়ারও সময় হয় নি। এমন করে দীর্ঘ কয়েক বছর চলে গেল, ধীরে ধীরে কিছু টাকা জমিয়ে নিজস্ব একটি গ্যারেজ খুলল এবং কিস্তিতে ছোট একটি গাড়িও কিনে ফেলল। দীর্ঘ ১৫ (পনেরো) বছর পর তার কাছে ৭২টি গাড়ি এবং তার মাসিক রোজগার ৩-৪ লক্ষ টাকা, যখন তার বয়স ৩২ বছর।

মানুষের বেদনা বা দুঃখ অনেক সময় মানুষকে পিছনে ঠেলে দেয় বা অনেক সময় সামনের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনের লক্ষ্য, কাজের প্রতি সততা যদি বজায় থাকে তাহলে জন্মদাতা মা বাবাও যদি পিছু হঠতে সাহায্য করে তবুও নির্মলের মতো ছেলের কাজের নির্মলতা ও তার জীবনের লক্ষ্য থেকে হার মানাতে পারবে না।

উপরোক্ত গল্পটি গল্প হলেও বাস্তবিক অর্থে তা সত্য।

(গল্পে চরিত্রের নাম ও স্থানের নাম কাল্পনিক)

লেখনী

–নির্ঝর পাল

আবিশ্ব ভারত তার কর্মময় রথচক্র
এক নিবিড় স্তব্ধতায়–
নিমজ্জিত করে দিয়েছে।
প্রাণদায়িনী এই গ্রহ আজ হয়ে উঠেছে প্রাণ সংহারক।
মহাকালের পাতা থেকে আহরণ করা প্রতিটি কালই
আজ যেন এক উন্মাদ কালবেলায় রূপান্তরিত।
জীবন-মরণের সন্ধিলগ্নে এই বিপন্ন পৃথিবীর
বুকের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে মেহের আলি–
"তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্"।
পাগলা মেহের আলি, কাকে দূরে পাঠাচ্ছ ?
এই মহামৃত্যু মিছিলকে, নাকি জীবন নামক সম্পর্ককে,
যার বাঁধনে আমরা পৃথিবীর বন্দীদশায় আছি ?
'মিথ্যা' বলে কী প্রমাণ করতে চাও ?
এই পৃথিবীকে ? নাকি তার বুকে খেলে বেড়ানো মানবকুলকে ?
না প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন ধারাকে ?
মেহের আলি, পৃথিবীর মানবজাতির হয়ে – আমি অকপট
নতমস্তকে স্বীকার করছি, আমরাই তো
"এই বাসে ভরা ফুর, রসে ভরা ফল" কে নীল বিষে করেছি পূর্ণ।
পরশুরামের মতই, এই ভারত তথা সমগ্র ভূ-মন্ডলে আমরাই
কুঠারাঘাতে জননীর প্রাণ-হন্তারক হয়ে উঠেছি।
সুনীল আকাশের অমল সূর্যালোক, নক্ষত্রখচিত গগনমন্ডলের
সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিমায় মিশিয়েছি কূটবিষ।
সেই বিষের দহনে দহিত, আজ কতই না গর্বের জীবমন্ডল।
জীবনরস উজাড় করে দিয়ে জীবনপাত্র যে আজ হলাহলে পূর্ণ।

মেহের আলি, কবে আমাদের চেতনার আলোয় আমরা
আলোকিত হব ? আর কত মহামৃত্যু মিছিলের পর
আমরা বলতে পারব – "এ জীবন পুণ্য কর,
এ জীবন সহজ কর।
এ জীবন সরল কর।"
আজো প্রতিটি রাতের নীরব নির্জন লগ্নে মেহের আলির
গগনবিদারী আর্তনাদে ভরে উঠে প্রাণীলোক–
"তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্"।

বেরঙিন সময়ে

-মিতালী দে

সুরক্ষা কবচ ছিঁড়ে ফুড়ে আচম্বিতে – অমিত্র
সঙ্গোপনে, নীরব পদচারণায়
গভীরতার দিকে।
জিরোয় – হয়তো কয়েকটা দিন নির্মম নৈঃশব্দে
সময়ের অবগাহনে রক্তপলাশ বাধা ছড়ায়
কুঁড়ে কুঁড়ে খায় সারাৎসার।
লুকানো প্রখর নখগুলো থাবার ভেতরে বিশ্রামে।
বিপন্ন সময়ে – জীবন তখন বেসামাল,
করুন কান্নায়।
অস্থির এক একদিন সুদীর্ঘ অসংলগ্ন
নিঃসহায়,
বিধাতার দরবারে সমর্পনের প্রার্থনায়।
কালান্তরে চলে যাওয়া জীবনের যত –
ঘাত প্রতিঘাত, গুপ্ত অপরাধ, অবৈধ যন্ত্রণার
আকর সামনে আসে, কৈফিয়ত চায়, কৈফিয়তে
কৈফিয়তে জেরবার।
উথাল পাতাল সময়ে–
ঘাতক তখন বিচারকের ভূমিকায়।

শারীরশিক্ষা ও বর্তমান সমাজ

– প্রসেনজিৎ দেবনাথ

শারীরশিক্ষা হল বর্তমান সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শারীরশিক্ষাকে অনুসরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়। তাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ, সবল ও নিরোগ রাখতে বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে শারীরশিক্ষার প্রয়োগ করতে হবে।

শুধুমাত্র পুথিগত শিক্ষা সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে শারীরশিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ শারীরশিক্ষায় অংশগ্রহণে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে যা ব্যক্তিকে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। শারীরশিক্ষায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence) সাহায্য করে।

শারীরশিক্ষার লক্ষ্য হল বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। মানুষ সামাজিক জীব তাই সমাজের কাছে কিছু দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে। তাই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করাও এই শিক্ষার লক্ষ্য।

“Education is the manifestation of perfection already in man” অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সে সুস্থ সম্ভাবনা বা প্রতিভাগুলি রয়েছে সেগুলি যথার্থভাবে বিকাশ করা।

শারীর শিক্ষাবিদ J.F. William এর মত অনুযায়ী শারীর শিক্ষার লক্ষ্য হল যথোপযুক্ত নেতৃত্ব দ্বারা পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে ব্যক্তি ও দল এমন সব ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে, সেগুলি হবে শারীরিক দিক থেকে উপকারী, মানসিক দিক থেকে তৃপ্তিদায়ক এবং সামজিক দিক থেকে হবে স্বাস্থ্যপ্রদ।

বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সুষম বিকাশ বলতে দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশকে বোঝানো হয়। তাই শারীরশিক্ষা বলতে শুধুমাত্র খেলাধূলা বা অঙ্গ-সঞ্চালনকেই বোঝায় না, এর অর্থ অত্যন্ত গভীর। শারীরশিক্ষার নানা কর্মসূচীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটায়। সৎ, চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী, সহনশীল, সহানুভূতিশীল, উপকারী মানব সম্পদ সৃষ্টি করে যা বর্তমান যুগে একান্ত কাম্য।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের এক তৃতীয়াংশই পর্যাপ্ত শরীরচর্চা করছে না। একারণে নানা শ্রমবিমুখ জনিত রোগে (Hypocripte Disease) বিশ্বে প্রতি বছর ৫৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে। এই বিষয়টা এতটাই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছেছে যে তার মোকাবিলায় আরও ব্যাপকভাবে নতুন করে ভাবা দরকার।

গবেষনায় দেখা গেছে উচ্চ উপার্জনশীল মানুষেরা পরিশ্রম কম করেন। ফলে শারীরিক সক্রিয়তা কম। আজকাল শিশুরা শরীরচর্চার সময় কম পায়। যদিও শিশুরা খেলে তা

কম্পিউটারের সামনে বসে VDO গেমস ফলে অল্প বয়সেই তাদের চোখে চশমা, মেদবহুল শরীর এবং নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়াও অল্প বয়সেই ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক মাধ্যমে দিনের অনেকটাই সময় কাটায় যাতে করে পড়াশুনার পাশাপাশি শারিরীক ও মানসিক দিকেরও অবনতি ঘটে।

বর্তমান সমাজ বিজ্ঞান নির্ভর, বিজ্ঞান দিয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, যার ব্যবহারে আজ মানবজাতি অনেকাংশেই কর্মবিমূখ হয়ে পড়েছে। বর্তমান দিনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা মানুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্র নির্ভর হয়েছে। আধুনিক যন্ত্র দ্বারা কঠিন কাজ অতি সহজেই করা সম্ভব হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে রোবট দ্বারা কাজ করানো হচ্ছে। সকাল থেকে রাত্রিতে ঘুমানোর পরেও আমরা প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান ভিত্তিক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। এর ফলে মানবজাতি আজ বিপদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমানে গ্রাম ও শহরের ক্রীড়াঙ্গনগুলি প্রায়ই ফাঁকা দেখা যায় কারণ বেশীরভাগ যুবসমাজ আজ (Digital Adiction) ডিজিটাল আসক্তির প্রতি আকৃষ্ট। যার ফলস্বরূপ তার বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত।হ্রাস পেয়েছে কর্মদক্ষতা এবং হ্রাস পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা ভালভাবেও বুঝতে পারছি যে শরীরচর্চা এবং আমাদের শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে COVID-19 থেকে আমরা রক্ষা পাব। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা ও সুষম খাদ্য আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে যাতে করে আমরা সুস্থ ও সবল থাকতে পারি। তাই "প্রতিরোধ রোগের চিকিৎসার চেয়ে বেশী ভাল" (Prevention is better than cure)।

বর্তমান দিনে শারীরশিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক তা অনস্বীকার্য।

* * * *

করোনা নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা

– দীপালোক ভট্টাচার্য

করোনা ভাইরাস মহামারী নিয়ে সারা দেশ এক ভয়াবহ আতঙ্কে আতঙ্কিত। আমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে এই করোনা ভাইরাস মহামারীর শিকার হই। ইংরেজী ১২/৮/২০২০ বুধবার বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে আমি এবং আমার সহকর্মী ৫ জন রওনা দিই চুড়াইবাড়ী কোভিড টেষ্টিং সেন্টার-এ। স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে অনেক রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয় আমাদের, আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটি বে-সরকারী নার্সিংহোমে কর্মরত। রোগী নিয়ে কাজ করার সুবাদে এবং পরিবারের সুরক্ষার্থে কোভিড-১৯ অ্যান্টিজেন টেষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিই। চুড়াইবাড়ী পৌঁছলাম বাইকে করে আমি আমার সহকর্মীরা।

চুড়াইবাড়ীতে গিয়ে নিয়মানুযায়ী টোকেন নিলাম, নিয়ে সারিবদ্ধ হলাম। স্বাস্থ্যকর্মী পি.পি.ই পরে তৈরী হলেন এরপর শুরু হলো টেষ্টিং, একের পর এক টেষ্টিং চলছে কেউ পজেটিভ, কেউ বা নেগেটিভ। এক এক করে আমার পালা এল। আমি সাহসীকতার সাথে গেলাম টেষ্ট করালাম, করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার নাম ডাকা হল আমি এগিয়ে আসলাম, তখন কিছু বলা হয়নি আমাকে কিছুক্ষণ পর আমি ও আমার সাথে আরো ২-৩ জনকে একটি ঘরে আবদ্ধ করা হল। আমার সহকর্মীরা একজন একজন করে টেষ্ট করলেন। আমাকে বাইরে থেকে সান্তনা দিলেন তারা। ভাগ্যবশত: আমার সহকর্মীরা সবাই নেগেটিভ আসলো।

আমি একা তাদের মধ্যে পজিটিভ। মনটা মনমরা হয়ে গেলো। এক সাথে এসেছিলাম অনেক আনন্দ হয়েছিল কিন্তু যাবার সময় ওদের মনও বিষন্ন হয়ে গেল।

আমি বদ্ধ ঘর থেকে ফোনে আমার সহকর্মীদের সাথে কথা বলি। ওরা আমাকে সান্তনা দেয়, মনে সাহস যোগায় এবং বলে আমার কাপড়-চোপড় নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ ওরা কোভিড কেয়ার সেন্টারে পানিসাগরে পৌছে দেবে। পজিটিভ থাকায় আমি বলার আগেই ধর্মনগরে আমার বাড়িতে খবর চলে যায়। চুড়াইবাড়ীতে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী আমার পরিবারের সবাইকে চেনেন, উনি ফোন মারফৎ খবর পাঠিয়ে দেন।

আমার মা প্রথম ফোন করে জিজ্ঞেস করেন আমার কী পজেটিভ নাকি, এরপর আমি বললাম হ্যাঁ যা শুনেছো সত্যি। মা, বাবা, ভাই বোন ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করে, আমি তাদের সহানুভূতি দেই এবং আশ্বাস দেই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। কারণবশতঃ আমার কোন কোভিড-এর লক্ষণ ছিল না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে কোভিড লক্ষণহীন রোগী বলা হয়ে থাকে (Asymptomatic Patient)। একটু পড়াশুনা করে দেখলাম কোভিড লক্ষণহীন রোগী (Asymptomatic Patient) খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। প্রায় ৩-৪ ঘন্টা বদ্ধ ঘরে থাকার পর ৭ জন কোভিড পজেটিভ রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে রওনা দেই পানিসাগর কোভিড কেয়ার সেন্টার-১ এ। গাড়ী ছাড়ার সাথে সাথে ফোন করি আমার সহকর্মীদের। উনারা বাইকে করে আধঘন্টার মধ্যে এসে আমাকে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে যায়। আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মীদের প্রতি আমাকে সাহায্য করার জন্য।

১২-৮-২০২০ থেকে আমার এক অন্য রকম পরিবেশ নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস।

বদ্ধ ঘর এক সাথে প্রায় ৮০ জন লোক, প্রত্যেকের আলাদা বিছানা, জিনিসপত্র রাখার রেক, চার্জার পয়েন্ট ইত্যাদি। হোস্টেল লাইফ কাটিয়েছি প্রায় ৫ বছর তাই খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না।

যাইহোক মনের জোর আর পরিবার প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রার্থনা বালোবাসায় দিন কেটে গেল। স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ করায় কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাবুদের চেনা জানা ছিল আগে থেকেই। উনাদের নির্দেশ মত নিজেকে সুরক্ষিত রেখে ঔষধপত্র, খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মাফিক মানতে থাকি। তবে সময় কাটানোটা খুব কষ্টকর ছিল প্রতিদিন তারিখ দেখতাম আর দিন গুণতাম কবে টেষ্ট হবে আবার কবে ছাড়া পাব।

অনেক লোকের সাথে পরিচয় হয় কেউ বা ত্রিপুরার আবার কেউ বা বহি:রাজ্য তথা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাটনা ইত্যাদি জায়গার। তবে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে মাস্ক পরে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগিয়ে নিজ বিছানায় দূর থেকে গল্প করতাম। ফোন আসতো পরিবার প্রিয়জন থেকে ভিডিও কল, কনফারেন্সে কথা বলতাম এভাবেই দিন কাটতো।

কেউ বা খোঁজ নিত ভালো আছি কিনা খাওয়া দাওয়া করছি কিনা এগুলি। আবার কেউ বা বলতো কী কী মেডিসিন দিয়েছে এখানে ব্যবস্থা কেমন - এ সবই জিজ্ঞাসাবাদ চলতো।

ভালো লাগে আমার খবরাখরব নিত অনেকেই মনে হতো একটা মানসিক শান্তি। যাইহোক দেখতে দেখতে ২০-৮-২০২০ আমার টেষ্ট হলো। ২২-৮-২০২০ সন্ধ্যা বেলা আমার রিপোর্ট আসলো নেগেটিভ। নাম বলা হল মাইকিং করে, যারা নেগেটিভ উনাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে।

মনে একটা আলাদা শক্তি আসলো দুঃখও কিছু বটে এই বন্দীদশা থেকে বের হব কিন্তু বাড়ি যেতে পারবো না। কারণ আমার বাড়ির লোক ১৪ দিনের কোরারেন্টাইনে।

আমি বাইরে কয়েকদিন কাটালাম হোটেলে। এরপর কোয়ারেন্টাইন শেষ হল বাড়ির শান্তি আসলো আমি এবং আমার পরিবার সুরক্ষিত কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে মাস্ক পরতে হবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার করতে হবে। আমাকে কোভিড সেন্টার থেকে ছুটির সময় একটা কাগজে দেওয়া হল যেখানে লেখা ছিল ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার খেতে এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিন যুক্ত খাবার খাওয়ার জন্য এবং নিয়ম মাফিক যাতে চলাফেরা করি।

সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবার নিজ কাজে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে যোগদান করি। সমাজের কিছু দায়বদ্ধতা স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে, আমি আমার দায়িত্ব কর্তব্যে অটুট ছিলাম বলেই আবার কাজে যোগ দিলাম। কাজে যোগ দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে কাজ করতে থাকি এবং আমার পরিবার পরিজনের সুরক্ষিতের কথা মাথায় রাখি।

আমার সহকর্মীরা আমি ফিরে আসায় খুব খুশি ওদের মনে একটা আনন্দের উল্লাস আমি বুঝতে পারি।

মনের জোর আর আত্মবিশ্বাস এবং পরিবার পরিজনের ভালোবাসা, প্রার্থনা আশীর্বাদ সাথে থাকলে করোনা জয় করা সম্ভব।

ডাক্তারবাবু এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ মতো চললে করোনা জয় করা সম্ভব।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ভয় ভীতি ছাড়ুন রোগ থেকে বাঁচুন রোগীকে ভালো থাকুন, আত্মবিশ্বাস জোগাতে সাহায্য করুন।

* * * *

অসংলগ্ন কথাবার্তা

– দধিচী

পর্ব - ১ম

হুম্ আলোচনা করা উচিত। কি নিয়ে আলোচনা হবে ? আচ্ছা এই ধরুন যদি ছন্নছাড়া ভাবে আলোচনা করা হলে তা কেমন হতে পারে ? আসলে আর কিছুই না, মাথার কিছু আসছে না, তাই মুখ লুকানোর ছোট্ট প্রয়াস। কথা হচ্ছে ব্যাপারটা এমন নয় যে এই ম্যাগাজিনের প্রকাশক আমার পেছনে হন্যে হয়ে পড়েছেন যে আমাকে কিছু একটা লিখে দিতেই হবে, আবার এমনটাও নয় যে আমি বড় কোন সমাজ সংস্কারক যার নিজের নাম না দিয়ে ছদ্মনামে লেখা প্রয়োজন, কারণ জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। কোনটাই নয়। তাহলে নাম কেন প্রয়োজন ? কারণ এমনটা তো নয় যে আমরা নাম দিয়েই সব যাচাই করি, নাকি ঠিক তাই ? আমার নাম ছয়খানা হাতি টেনে নিয়ে যায় বলে আপনারা রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান, আর ছোট্ট নামের লাল পিঁপড়ের জুতোর তলালয় পিষে ফেলেন !

এই হচ্ছে গিয়ে চিরাচরিত সামাজিক অভিযোগ। পূজোর ম্যাগাজিন হবে, কিছু একটা লিখতে হবে, কি লেখা যেতে পারে ? সব থেকে সোজা হচ্ছে ‘নাই’ আর ‘খারাপ’ গল্প শোনানো। যেমন ধরুন পোড়া দেশে নারী নেই, স্বাধীনতা নেই, গরীবের মুক্তি নেই, আবর্জনা (সামাজিক ও বাস্তবিক) ফেলার জায়গা নেই, শান্তি নেই, জল নেই, ঠান্ডা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি প্রতিবছর অভিযোগের ফুলঝুড়ি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। বলতে পারেন তারপর কি হয় ? আপনি ম্যাগাজিনটা সরিয়ে দেখে দু-মিনিট ভাববেন, আর যেসব ভাববেন আমি সমাজ উদ্ধার করলাম। এই ভাবনা কখনোই আমাদের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গায় না। পরদিন সকালে উঠেই আমরা ট্রাফিক পুলিশকে ঘুঁষ দেই, পাড়ার মোড়ের দাড়িয়ে প্রতিবেশীর মেয়েটির শরীর পিতল দিয়ে কেন বানালেন ভগবান তাই ভাবি, মোদী আর রাহুলের মধ্যে কে দেশ উদ্ধার ভালো করেন তা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় আর ফেসবুকে সাইক্লোন তুলি। দায়িত্ব পালনেও আমরা পিছিয়ে আসি না, সংবাদ মাধ্যম আমাদেরকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে; আমাদের নিজেদের প্রমাণ করতে হবে আমরা সুপ্রীম কোর্ট থেকে উত্তম বিচার করতে পারি, তাই বিচার ব্যবস্থা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ঘোষণা করা হোক। আমরা সব বুঝি, সব জানি তাও আমাদের জীবনে শান্তি নেই। তাহলে কি যারা অজ্ঞ তারা শান্তিতে আছে ? তাও নয়। তাহলে এবার উপায় ?

পর্ব - ২য়

সব থেকে বিষাক্ত দ্রব্য কি আছে যা খেয়ে আপনি মারা যেতে পারেন ? নাহ্ সায়ানাটও নয়। ভাবুন, একটি অ্যামিবা মারা গেলে আপনি কি চিন্তিত হোন ? নিশ্চয়ই না ? এবার দু-মিনিটের জন্য নিজেকে অ্যামিবা ভাবুন। ভাবুন আপনি প্রতিদিন খাবার খান, বিকেলে প্রেমিকার সাথে ঘুরতে যান, কয়েক বছর পর মারা যান। মানুষ হলেও কি আপনি এর থেকে

বেশি কিছু করতেন ? তাহলে আপনি মানুষ বা অ্যামিবা তাতে কি আদৌ কিছু এসে যায় ? আপনি বড় হবে, আপনার বয়োঃজ্যোষ্ঠরা আপনাকে 'স্যাটেল' হতে বলবে। আপনি তা শুনবেন তারপর আপনি একদিন এই পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন। আপনার অল্টার ইগো সেই অ্যামিবাও ঠিক তাই করবে। এবার উপায় ?

পর্ব - আপদ

নিমপাতা বাবু ইমপোটেড সিঙ্গেল মল্টটি দামী কাঠের গ্লাসে ঢেলে নিজের পাঁচ ছয়খানা চ্যালা চামুন্ডার দিকে বিরক্তি ভরে তাকালেন। সেই ব্যাটারা দলিত জনপদ থেকে মেয়ে তুলে এনে রাতভর ধর্ষণ করে ধানের ক্ষেতে ফেলে দেয়। সবই ঠিক আছে কিন্তু বডিটা জ্বালিয়ে দিলে কি হতো ? সে কাজটা করার জন্য আবার মাঝ রাতে পুলিশকে ডাকতে হলো। একি পুলিশের কাজ, পুলিশ পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। চার ঘন্টা সময় নিল আগুন পুরো শরীর খেয়ে নিতে। তারপর দু-এক টুকরো হাড় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইলো। ভাবুন যে শরীর খুবলে খেতে নিমপাতা বাবুর ছয়টি ছেলের পুরো রাত লাগলো, সেই একা শরীর আগুন মাত্র তিন চার ঘন্টায় খেয়ে নিল ! আশ্চর্যজনক নয় কি ? এই রকম ঘটনা এই মহা-ভারতে পান্ডব গৃহিত ও পান্ডব বর্জিত দুই জায়গাতে ঘটে। নিমপাতা বাবু নির্বাচনে লড়েন, সকল ধর্মের পুণ্যস্থান ভারতে ধর্মের রক্ষা করেন। লোকে বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; তা নড়ে বটে তবে সেই ধর্মের ফল নিমপাতা বাবুর টেবিল ফ্যান ! কথাগুলো শুনে কেমন গা ছিম ছিম করছে না ? এই দেশে ধর্ম আর শরীর একে অপরকে কখনো ছেড়ে যায় নি। ধর্ম রক্ষায় শরীর যায় তা আমরা মানি না; শরীর রক্ষায় ধর্ম যাতে না যায় তাই নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা।

প্রাচীন কবি জিজ্ঞেস করলেন শুনুন "ও বাবু এবার উপায় কি ?"

পর্ব - বিপদ

১। " । গাছ তলাতে শুয়েছিল হারাধন দাস
নিমবাবুর শালা তিনি আদমী অতি খাস।"

তা সেই হারাধন দাস বাবু হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ব্যবসা চালান, ভোটের আগে কয়েকটা লোক কটু কাটা করেন তা নিয়ে নেতারা গলার শিরা ফোলান, আমি আপনি বর্ষাকালের গলা ফোলা ব্যাঙ দেখি আর নাই বা দেখি ভোট নেতাদেরকেই দেই। বিনিময়ে হারাধন বাবু পান উপঢৌকন, আর আমরা পাই মানসিক শান্তি। হারাধন বাবুর নাম রহমত খাঁ হলেও আমার কোন আপত্তি নেই। আমার আপত্তি কেন থাকবে ? যেখানে কয়েক লক্ষ সৈনিক সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, যাদের জন্য আপমি রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারছি এসবের পরেও আমায় কেন আপত্তি থাকবে ? কোন চতুষ্পদ প্রাণী কোনদিন আপত্তি করেনি, তাহলে আমরা দু-পেয়েরা কেন করবো ? 'আপত্তি' এই শব্দটিতেই আমার আপত্তি আছে। বলুন দেখি এই যে আপনি, আপনি কি গত দুশো বছর ধরে আপত্তি জানিয়েছেন ? জানাননি তো ? তাহলে এখন কেন জানালেন ? তারপরেও আপত্তি জানাতে চান ? প্রশ্ন করুণ উপায় কি ?

আলো ও আঁধার প্রকৃতির নারী ও পুরুষ

–সুস্মিতা আচার্য্য

বৈপরীত্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই পরিপূরক বিপরীত বিন্দু থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি যে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা ভাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একে অন্যের সাথে অঙ্গীভূত একটিকে অনুভব না করলে অন্যটির আস্বাদ পাওয়া যায় না।

"আলো ও আঁধার ঠিক তেমনি"

আলো কর্মচঞ্চল আর আঁধার স্নিগ্ধতা, বিশ্রাম। তবে দিনের চঞ্চলতা অনুভব না করলে রাতের মুগ্ধতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা অনুভব করা যায় না। আমাদের মন এমনই যেখানে কোনো কিছুর আধিক্য বেশীদিন সহ্য করা যায় না।

এমনই প্রকৃতির দুই বিপরীত সৃষ্টি নারী ও পুরুষ। আমাদের পুরাণ ও সংহিতায় এদের সৃষ্টি রহস্য আত্মার অভিন্নতা সুন্দর ভাবে বর্ণিত। নারী হল শস্য শ্যামলা প্রাণপূর্ণা, নব সৃজনের প্রতীক আর সেই আদিশক্তির রূপ যে স্বমহিমায় সংসারকে সুন্দর করে পেলে। তেমনি পুরুষ হল সদা গতিময় কর্মচঞ্চল প্রকৃতির।

নারী যেমন দশভূজা রূপে অবতীর্ণা হয়ে ঘর আগলে রাখে পুরুষ ও তেমনি সেই সংসারের চাকাকে দায়িত্ব, কর্তব্য রূপী অবদান দিয়ে রক্ষা করে। একে অন্যের সত্যি পরিপূরকই বটে।

তবে কেন হবে এই বৈষম্য। কেন পাবে না তারা সমান অধিকার। আমি যেমন একচ্ছত্র পুরুষ আধিপত্যের বিরোধীতা করি ঠিক তেমনি নকল নারীবাদীদেরকেও সমর্থন করতে নারাজ।

চলো না সবাই মিলে এমন এক সমাজ গড়ি যেখানে কোনো নারীকে তার গায়ের রঙ নয় তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি আর কোনো পুরুষকে তার সরকারী চাকরী আর গাড়ী দিয়ে নয় বরং তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে বিচার করতে পারি।

* * * *

Growing Seed
আয়োজিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর কিছু মুহূর্ত

A Flex Printing Unit

Prop.: Biswajit Dam

ULTIMATE DESIGN

Nayapara Kalibari Road,
Opp. Assam Oil Quater Complex,
Dharmanagar, North Tripura

8787 88 68 94

dambiswajit@gmail.com

HIGH DEFINATION COLOUR THAT MAKES A BIG IMPRESSION

Best Quality Product with Affordable Price

GUARANTEED

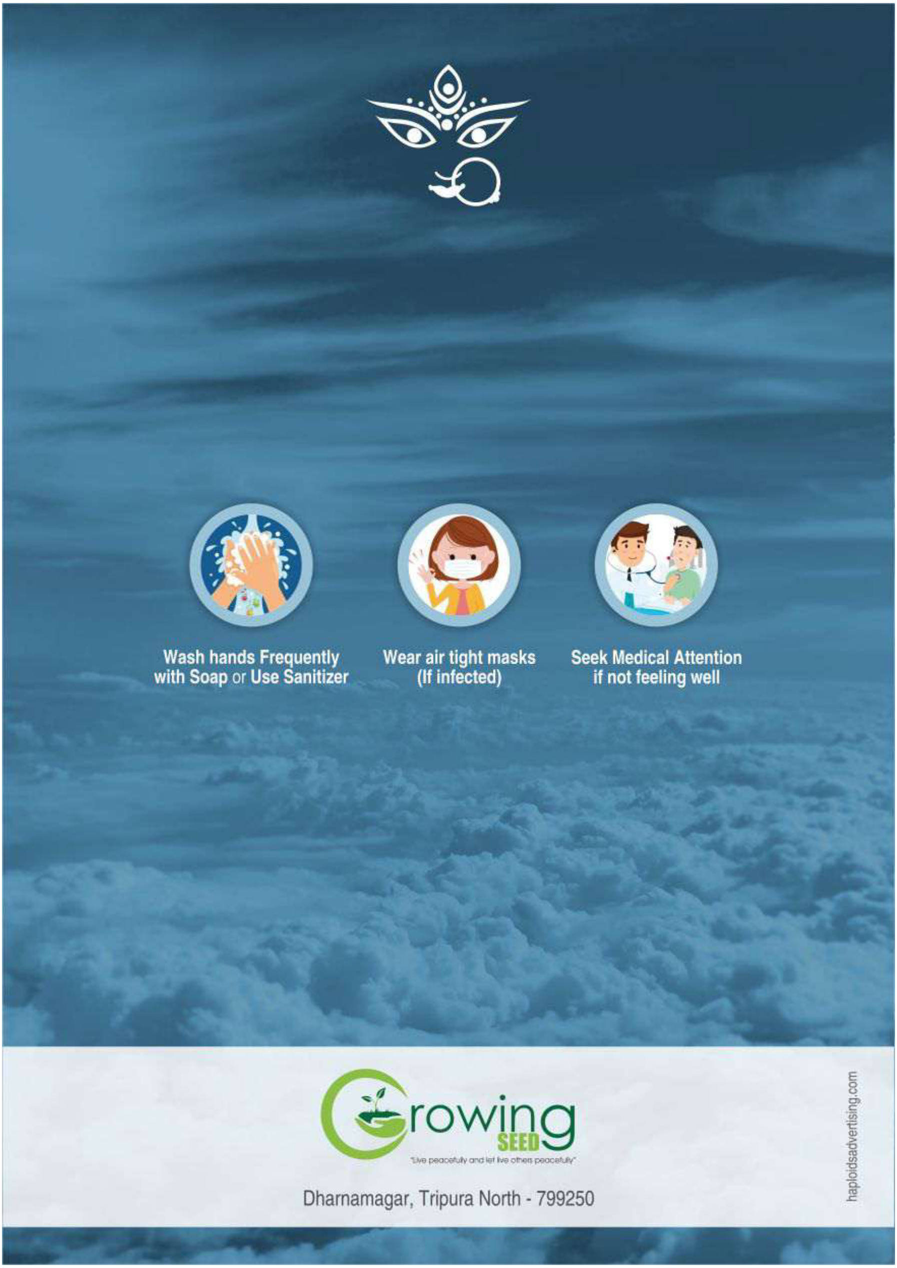

Wash hands Frequently
with Soap or Use Sanitizer
Wear air tight masks
(If infected)
Seek Medical Attention
if not feeling well
Growing
SEED
"Live peacefully and let live others peacefully"
Dharnamagar, Tripura North - 799250
haploidsadvertising.com